Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রেমচেতনা

Love In Tagore's Songs

গবেষক

নাঈমা ইসলাম

এম. ফিল. (সংগীত)

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২২০

শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

সংগীত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সংগীত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রেমচেতনা

Love In Tagore's Songs

গবেষক

নাঈমা ইসলাম
এম. ফিল. (সংগীত)
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২২০
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তত্ত্বাবধায়ক

ড. শাহনাজ নাসরীন ইলা
অধ্যাপক
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক

ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, *রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রেমচেতনা* শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব রচনা। *রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রেমচেতনা* বিষয়ে ইতঃপূর্বে অনেক গবেষক বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গীতে প্রতিফলিত প্রেমচেতনা নিয়ে বিদ্যায়তনিক পর্যায়ে উচ্চতর কোনো গবেষণা হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য রচিত। এই গবেষণাকর্মটি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অন্য প্রতিষ্ঠানে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।

(নাঈমা ইসলাম)
এম.ফিল. গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২২০
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

Department of Music

University of Dhaka

Dhaka1000, Bangladesh, Phone: PABX 9661900-59/4240, Fax: 880-2-8615583, Email: duregstr@banglanet

প্রত্যয়নপত্র

[যার জন্য প্রযোজ্য]

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, নাঈমা ইসলাম (রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২২০, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-১৬) সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উপস্থাপিত *রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রেমচেতনা* শীর্ষক এম.ফিল. পর্যায়ের গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশ কোথাও মুদ্রিত হয়নি এবং গবেষক অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ডিগ্রির জন্য ইতঃপূর্বে উপস্থাপন করেননি।

ড. শাহনাজ নাসরীন ইলা

গবেষক তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক

সংগীত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

Department of Bangla

University of Dhaka

Dhaka1000, Bangladesh, Phone: PABX 9661900-59/4240, Fax: 880-2-8615583, Email: duregstr@banglanet

প্রত্যয়নপত্র

[যার জন্য প্রযোজ্য]

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, নাঈমা ইসলাম (রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২২০, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-১৬) সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উপস্থাপিত *রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রেমচেতনা* শীর্ষক এম.ফিল. পর্যায়ের গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশ কোথাও মুদ্রিত হয়নি এবং গবেষক অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ডিগ্রির জন্য ইতঃপূর্বে উপস্থাপন করেননি।

ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ

গবেষক যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

ছেলেবেলায় সঙ্গীতের হাতেখড়ি হওয়ার কয়েকবছর পর থেকেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে পরিচয়। বাবা, মা ও বড় ভাইয়ের বিশেষ অবদান আমার গান শেখায়। আলাদা করে বাসায় শিক্ষক রেখে রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চায় সুযোগ করে দিয়েছিল আমার পরিবার। তাই চতুর্থ শ্রেণি থেকে আমার রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছিল। না বুঝেই তখন গানগুলি গাইতাম। পরবর্তী সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীত বিভাগে রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে পড়ার সময় শ্রদ্ধেয়া শিক্ষিকা অধ্যাপিকা ড. শাহনাজ নাসরীন ইলা সবসময় বলতেন গান শুধু সুরে গাইবার জিনিস নয়, অন্তর্নিহিত ভাবটি বুঝে গাইলে সেই গানটি শ্রোতার কানে সুখকর হয়। রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রেমের গানগুলি ছাত্রজীবন থেকেই আমার বিশেষ প্রিয়। পরবর্তী সময়ে আমার সঙ্গীতগুরু আজিজুর রহমান তুহিনও বলেন, গানের ভাব বুঝতে হলে এবং গায়কীতে সেই ভাব ফুটিয়ে তুলতে হলে ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথকে জানতে হবে। সেই থেকে আগ্রহ এমন বিষয় নিয়ে কাজ করার যা আমাকে রবীন্দ্রনাথকে জানতে সাহায্য করবে, সেই সাথে গানের ভাবকে বুঝতে সাহায্য করবে। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান আমার প্রিয় হওয়ায় *রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রেমচেতনা* নিয়ে আমার গবেষণার আগ্রহ হয়।

আমার শ্রদ্ধেয়া শিক্ষিকা অধ্যাপিকা ড. শাহনাজ নাসরীন ইলা সংগীত বিভাগে পড়ার সময় থেকেই স্নেহের সাথে আমাকে সবসময় আমার শিক্ষার্থী জীবন ও পরবর্তী চাকুরি জীবনে পরামর্শ দিয়ে আসছেন। তাঁকে প্রেমের গান বিষয়ে গবেষণার বিষয়ে আগ্রহ জানালে তিনি আমাকে অনুমতি দেন কাজটি করার। কিন্তু চাকুরির নিয়মগত জটিলতায় আমি গবেষণা কাজটি শুরু করতে পারছিলাম না। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষের প্রতি আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই, তিনি আমাকে সহজ করে দিয়েছেন যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকায় থেকে আমার গবেষণার কাজটি শুরু করার পথ দেখিয়ে।

বর্তমানে পুরো বিশ্ব 'করোনা' নামক বৈশ্বিক মহামারীর মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে দীর্ঘ সময় ধরে। এই সময়ে আমার শিক্ষিকা অধ্যাপিকা ড. শাহনাজ নাসরীন ইলার সম্পূর্ণ সহযোগিতায় নানান প্রতিকূলতার মধ্যেও আমাকে তাঁর তত্ত্বাবধানে গবেষণার পুরো কাজটি সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি স্নেহ-মমতায় শাসনে আমাকে আবদ্ধ করে রেখেছেন। আশা করি তাঁর সাথে এই বন্ধন আমার আজন্ম থাকবে। তাঁর প্রতি জানাই অশেষ শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা। আমার গবেষণা থিসিস পর্বের কাজটি শুরু করার প্রেরণাদাতা হিসাবে আমার বাবা মো. নজরুল ইসলাম, মা কামরুন নাহার, বড় ভাই উসামা খালিদ এবং আমার স্বামী স্বরূপ হোসেনসহ আমার পরিবারের সকল সদস্যের প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। করোনাকালীন সময়ে তাঁরা প্রতিনিয়ত উৎসাহ ও সহযোগিতা দিয়ে পাশে ছিলেন, কখনো এতটুকু বিরক্ত হননি। তাঁদের প্রতি জানাই অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে আমার বিভাগের সকলের কাছ থেকে পরামর্শ ও সহযোগিতা পেয়েছি। অনুজপ্রতিম চয়ন চক্রবর্তী ও স্নেহের ছাত্র চিরঞ্জিত সাহা ও আমার সহকর্মীসহ যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাকে গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করতে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

তথ্য সংগ্রহের জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, সংগীত বিভাগের সেমিনার গ্রন্থাগার, ছায়ানট সংগীত বিদ্যায়তনের পাঠাগার, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই।

নাঈমা ইসলাম

এম.ফিল. গবেষক

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২২০

শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

সংগীত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

অবতরণিকা

প্রথম অধ্যায় ১১ - ২৯

রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ও প্রেমভাবনা

দ্বিতীয় অধ্যায় ৩০ - ৮৭

রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রেমচেতনা

১ম পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রেমচেতনার সূচনালগ্ন

২য় পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রেম : মিলন ও বিরহ

৩য় পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রেম ও পূজা

তৃতীয় অধ্যায় ৮৮ - ১০৬

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান : বাণী ও সুর

চতুর্থ অধ্যায় ১০৭ - ১২৪

বাংলা প্রেমসঙ্গীতের ধারায় রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা

উপসংহার ১২৫ - ১২৮

সহায়ক-গ্রন্থ ১২৯ - ১৩১

Dhaka University Institutional Repository

অবতরণিকা

বাংলা সঙ্গীতের ধারায় চিরকালের এক উজ্জ্বল নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। বিচিত্রভাবের গান রচনার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ভাব তাঁর প্রেমচেতনা। তাঁর গানে প্রেম নানা মাত্রায় শিল্পরূপ লাভ করেছে। অভিসন্দর্ভের প্রথমে গবেষণা প্রস্তাবনা, গবেষণার পদ্ধতি এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণার পর্যালোচনায় স্থান পেয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি *রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ও প্রেমভাবনা*। রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক আভিজাত্য, প্রথম জীবনের লব্ধ অভিজ্ঞতা উভয়ই তাঁর জীবনদর্শন ও প্রেমভাবনায় প্রভাবিত করেছিল, যা এই অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে *রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রেমচেতনা* শিরোনামে *রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রেমচেতনার সূচনালগ্ন*, *রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রেম : মিলন ও বিরহ*, *রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রেম ও পূজা* তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছি। রবীন্দ্রনাথের বয়সের ধারাবাহিকতায় সম্পূর্ণ বিষয়টি বোঝার সুবিধার্থে প্রেমপর্যায়ের গানগুলিকে কালানুক্রমিক সূচি দ্বারা তিনটি পর্বে বিভক্ত করেছি।

তৃতীয় অধ্যায়ে কালানুক্রমিক সূচির ধারাবাহিকতায় *রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান : বাণী ও সুর* বিশ্লেষণ করেছি।
চতুর্থ অধ্যায়ে *বাংলা প্রেমসঙ্গীতের ধারায় রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা* শিরোনামে চর্যাগীতির রচনাকাল থেকে শুরু করে পঞ্চকবি পর্যন্ত বাংলা প্রেমসঙ্গীতের ধারায় রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানের স্বকীয়তা নিরূপণ করেছি।

উপসংহার অংশে রয়েছে সমগ্র আলোচনার সমন্বিত রূপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও নিজস্ব অনুধাবন। সহায়ক গ্রন্থ অংশে রয়েছে অভিসন্দর্ভটি রচনায় সহায়ক যে গ্রন্থগুলি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তার তালিকা।

গবেষণার পদ্ধতি

গবেষণাকর্মটি বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে রচনা করেছি। উপাত্ত সংগ্রহের জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রেমপর্যায়ের গানগুলোই প্রধানত অনুসরণ করেছি। এছাড়া রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে ইতঃপূর্বে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁদের অভিসন্দর্ভ থেকেও প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করেছি।

প্রাথমিক উৎস

অভিসন্দর্ভের জন্য প্রাথমিক উৎস হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *গীতবিতান* (কলকাতা বিশ্বভারতী, কার্তিক ১৪১২) গ্রন্থটি ব্যবহার করেছি।

দ্বৈতীয়িক উৎস

অভিসন্দর্ভের জন্য দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত গ্রন্থের তালিকাগুলি সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিতে তালিকা আকারে উল্লেখ করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রেমচেতনা বিশ্লেষণে গানের ভাবের প্রতি গুরুত্ব দিতে হয়েছে। কবি তাঁর গানগুলো মনের কোন স্থিতি থেকে লিখেছেন তা তাঁর সেই সময়কার পারিপার্শ্বিক ঘটনা ও বয়সের উপর ভিত্তি করে শুধু অনুমান করা যায়। ব্যক্তিভেদে অনুধাবন ক্ষমতা ভিন্ন হয়। তাই বাণীর ভাব বিশ্লেষণে একই গান বিভিন্ন জনের নিকট নানান অর্থে অনুধাবিত হতে পারে। এখানে এই সীমাবদ্ধতাটি থেকেই যায়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ও প্রেমভাবনা

মানুষ সামাজিক জীব। পরিবার সমাজ এবং আমাদের চারপাশের পরিবেশের সমগ্রকে নিয়ে আমাদের বেড়ে ওঠা। প্রত্যেকটি মানুষের ভিন্ন ভিন্ন জীবনদর্শন গঠিত হয় সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে। মানুষ শিখে প্রকৃতি থেকেও। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ও প্রেমভাবনা আলোচনার পূর্বে তৎকালীন সমাজব্যবস্থা ও পরিবার সম্পর্কে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। রবীন্দ্রনাথের আদিপুরুষেরা ছিলেন ব্রাহ্মণ। জানা যায়-"জগন্নাথ কুশারীই ঠাকুর-বংশের-আদি-পুরুষ।"[১] তাঁর দ্বিতীয় পুত্র পুরুষোত্তম হতে ঠাকুর বংশের ধারা চলে আসছে। দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬) পারিবারিক ব্যবসা দেখাশোনার পাশাপাশি তিনি ছিলেন চব্বিশ পরগনার কালেক্টর অফিসের সেরেস্তাদার। অর্থ উপার্জনের আরেকটি মাধ্যম হয়েছিল তাঁর এই চাকুরি। তিনি কেবল অর্থ উপার্জনের দিকেই মনোনিবেশিত ছিলেন না, দেশ ও সমাজের উন্নয়নমূলক যে কোনো প্রচেষ্টার সাথে নিজেকে যুক্ত রাখতেন। হিন্দুধর্মের সংস্কার ও সতীদাহ নিবারণ প্রথায় রামমোহন রায়ের (১৭৭২-১৮৩৩) অবদান উল্লেখযোগ্য। দ্বারকানাথ রামমোহনকে এই কাজে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকে সহযোগিতা করেছিলেন। কারণ রংপুরের কালেক্টর অফিসের সেরেস্তাদারের কাজ ছেড়ে তিনি যখন কলকাতায় স্থায়ীভাবে চলে এলেন, তখনই দ্বারকানাথের সাথে তাঁর পরিচয় ও আলাপ হয়। রামমোহন দ্বারকানাথের থেকে বাইশ বছরের বড় হলেও মিশেছেন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো। তাঁদের দুজনার হাত ধরেই আধুনিক সভ্যতার রথ বাংলাদেশে প্রথম প্রবেশ করেছিল। রামমোহন রায় ১৮১৫-এ একেশ্বরবাদী হিন্দুধর্ম আলোচনার জন্য 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করেন। এই সভায় দ্বারকানাথ নিষ্ঠাবান মূর্তিপূজক হিন্দু হয়েও আলোচনায় যোগ দিতেন এবং যখন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ হয় তখন তিনি সহযোগিতাও করেন। নিয়মিত উপাসনাতেও উপস্থিত থাকতেন তিনি। সে সময় দ্বারকানাথ ছিলেন সামাজিকভাবে সম্মানিত ও প্রতিপত্তির অধিকারী।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫)। পিতার বিলেত যাত্রার পর দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজ পরিদর্শনে যান এবং এর প্রতি আকৃষ্ট হন। নিজ আগ্রহে তিনি ব্রাহ্মসমাজ পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। তত্ত্ববোধিনী সভা (১৮৩৯) ও ব্রাহ্মসমাজের (১৮২৮) বক্তব্য প্রচারের জন্য প্রকাশিত হয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৮৪৩)। ধর্মতত্ত্ব প্রচার ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের আলোচনাও সেখানে প্রকাশিত হতো। ফলে আধুনিক বাংলা গদ্যের রূপগঠনে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অবদান অনস্বীকার্য। দেবেন্দ্রনাথের সহিত অক্ষয়কুমার ছাড়াও বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি মনীষীরাও এ পত্রিকায় যুক্ত ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো- "১৮৬৫ শতকের ৭ পৌষ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে তিনটের সময় ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথসহ ২১জন বিধিপূর্বক প্রতিজ্ঞা পাঠ করে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে মহা উৎসাহে তিনি ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।"[২]

Dhaka University Institutional Repository

দেবেন্দ্রনাথের বিবাহ হয় যশোহর জেলার দক্ষিণডিহি-নিবাসী রামনারায়ণ চৌধুরীর কন্যা সারদাসুন্দরী দেবীর সাথে। তিনি পনেরোটি সন্তানের জনক ছিলেন। প্রথম একটি কন্যা (১৮৩৮) অকালেই মৃত্যুবরণ করার জন্য তার নামকরণাদি করা হয়নি বলে জানা যায়। তাই দেবেন্দ্রনাথের চৌদ্দজন পুত্রকন্যা বলা হয়ে থাকে। তার মধ্যে পুত্র ৯ জন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ছিলেন তাঁর অষ্টম পুত্র। পরিবারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা ছিলেন কাব্যদর্শন ও সঙ্গীতে যেমন পারদর্শী তেমনি অনুরাগী।

মহর্ষির প্রথম পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। দর্শন শাস্ত্র এবং বিজ্ঞানের গণিত চর্চায় তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। এছাড়াও শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীতেও তাঁর বেশ দক্ষতা ছিল। তিনি বাঁশি ও অর্গান বাজাতে পারতেন। রবীন্দ্রনাথ বড় দাদা সম্পর্কে বলতেন যে- "তাঁর বড় দাদার মত পণ্ডিত তিনি কম দেখেছেন।"[৩] দ্বিজেন্দ্রনাথ বেশ কিছু ব্রহ্মসংগীত রচনার পাশাপাশি আকারমাত্রিক স্বরলিপির সূত্রপাত করেছিলেন। মহর্ষির দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্য ও ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনিই প্রথম বড় বড় ওস্তাদের হিন্দি গান ভেঙ্গে ব্রহ্মসংগীত রচনা শুরু করেন। প্রগতিবাদী সত্যেন্দ্রনাথ বাড়ির অনেক প্রাচীন প্রথার পরিবর্তন সাধন করেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথকে সর্ববিষয়ে সুশিক্ষার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করেন। সে সময় নিজের কন্যা ইন্দিরা দেবীর জন্য তিনি ইউরোপীয় সঙ্গীত ও ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একজন একনিষ্ঠ সাধক। স্ত্রীশিক্ষা থেকে শুরু করে বাড়ির সমস্ত শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং প্রগতিশীল কাজে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। নিজের স্ত্রীকে সঙ্গীতে পারদর্শী করার জন্য ওস্তাদ নিযুক্ত করেছিলেন যা সে যুগের দৃষ্টান্ত হিসাবে বিরল। রবীন্দ্রনাথের- "কবিমানসে যার প্রভাব সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তিনি দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, সংগীতজ্ঞ, শিল্পী, নট এবং নাট্যকার। মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন (এপ্রিল ১৮৬৯) এবং সেই সময় থেকেই তিনি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ শুরু করেন।"[৪] কণ্ঠসঙ্গীত এবং সেতারসহ তিনি পিয়ানো, হারমোনিয়াম, বেহালা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাদনে দক্ষ ছিলেন। তাঁর রচিত গীতিনাট্য গুলিতে ইউরোপীয় অপেরার প্রভাব ছিল এবং কয়েকটি গানে তিনি পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সুরও দিয়েছিলেন। যেমন : "তিনি *'সরোজিনী'* নাটকের একটি গানের রাগের নামকরণ করেছিলেন 'ইটালীয়ান ঝিঝিট'।"[৫] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতাদের এই সকল গুণ ঠাকুর পরিবারের সাংগীতিক পরিবেশকে যেমন সমৃদ্ধ করেছিল তেমনি সেটি বালক রবীন্দ্রনাথকেও প্রভাবিত করেছিল।

বংশানুকূলতা যেমন ব্যক্তির চরিত্র গঠনের আদিসম্বল, স্থানানুকূলতা তেমনি চরিত্র বিকাশের প্রধান সহায়ক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনে এই দু'ইয়ের প্রভাব আমরা উপরের আলোচনা থেকে কিছুটা হলেও ধারণা করতে পারব। ঠাকুর বংশের আধিপত্য, পারিবারিক পরিবেশ, সাহিত্যচর্চা, সমাজ সংস্কার সবকিছুই কবিগুরুর জন্মের পূর্ব থেকেই বিশেষভাবে পালিত হয়ে আসছিল। তবে স্থানমাহাত্ম্যের অর্থ এই না যে, বিশেষ স্থানে বাস করলে

বা সাহিত্যচর্চার রীতি থাকলেই কতগুলো বিশেষ গুণের অধিকারী হওয়া যায়। পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে মানুষের জীবন কতখানি নিয়ন্ত্রিত হয় সেটাই হচ্ছে স্থানমাহাত্ম্য বা দেশপ্রভাবের যথাযথ অর্থ। ঠাকুর পরিবারের মধ্যে যে বৈষয়িক মানসিকতা ও আত্মিক গুণাবলির লক্ষণ দেখা যায়, তার জন্য সে সময়ের পাশ্চাত্য প্রভাবযুক্ত কলিকাতার প্রভাবও রয়েছে খানিকটা। বংশ ও স্থানের প্রভাব যেমন আমরা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করতে পারি না, তেমনি কালের প্রভাবকেও অস্বীকার করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের জন্মক্ষণে কালধর্মের নানান বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত চলছিল, নানা দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের জন্মাব্দ বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ ছিল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছিলেন যে- "১৮৫৬-১৮৬১ সাল পর্যন্ত বঙ্গসমাজের মাহেন্দ্রক্ষণ। এই স্মরণীয় কালের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্মপ্রচার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবাবিবাহ- বিষয়ক আন্দোলন, নীলকরের হাঙ্গামা ও হরিশ মুখুজ্জের 'হিন্দু-পেট্রিয়টে' তাহার প্রতিবাদ, বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বরগুপ্তের তিরোভাব (১৮১২-৫৯), মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) ও দীনবন্ধু মিত্রের আবির্ভাব, 'সোম প্রকাশে' অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যশালা স্থাপন ও নাট্য-সাহিত্যের মধ্য দিয়া জাতির আত্মপ্রকাশের প্রয়াস সংঘটিত হয়।"[৬]

রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে বাড়িতে কাব্যসাহিত্যের আলোচনার একটা স্রোত বয়ে চলছিল। বালক রবীন্দ্রনাথ শৈশব থেকেই সাহিত্য ও সঙ্গীতচর্চার সাথে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে বেড়ে উঠেছেন। সাহিত্যের রসগ্রাহিতা যেমন ঠাকুর পরিবারের ছেলে-মেয়েদের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল, গীতকুশলতা ছিল তেমনি তাঁদের প্রকৃতিগত। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সুকণ্ঠের অধিকারী। শিশুকালে তাঁর প্রধান সমঝদার ছিলেন শ্রীকণ্ঠ সিংহ। বাড়ির সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়ক বিষ্ণু চক্রবর্তী (১৮০৪-১৯০০), ধ্রুপদী হিসেবে তাঁর খ্যাঁতি ছিল। আর একটু বড় হয়ে তিনি যদুনাথ ভট্টাচার্যের (১৮৪০-১৮৮৩) নিকট সঙ্গীত শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন এবং তাঁহার প্রভাবই জীবনে স্থায়ী হয়। তাঁর সৃষ্টিধর্মী সঙ্গীত প্রতিভা রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করত। যদু ভট্ট সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন-

"বাংলাদেশে এরকম ওস্তাদ জন্মায়নি। তাঁর প্রত্যেক গানে একটি originality ছিল, যাকে আমি বলি স্বকীয়তা।... যদুভট্টের মত সংগীতভাবুক আধুনিক ভারতে আর জন্মেছে কিনা সন্দেহ।"[৭] রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত মানসে যদুভট্টের এই সঙ্গীত প্রতিভার প্রভাব দেখা যায়। কবির সঙ্গীত রচনার একটা নিজস্ব ধারা ছিল। তিনি নানান সময় নানান ভাবে অন্যগান দ্বারা প্রভাবিত হলেও তাঁর রচনার স্বকীয়তা ছিল স্বতন্ত্র। রাধিকা গোস্বামী, শ্যামসুন্দর মিশ্র দু'জনেই ঠাকুর পরিবারে সঙ্গীত শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। গুণী সঙ্গীত শিক্ষক ছাড়াও বাড়িতে আরও অনেক গুণী ওস্তাদ ঠাকুর পরিবারে গায়ক হিসেবে আশ্রয় পেয়েছিলেন। কবিগুরুর সর্বব্যাপী সঙ্গীত প্রতিভার স্ফুরণে তাঁদের পরোক্ষ শিক্ষা ও প্রভাবও যথেষ্ট পরিমাণে সহায়তা করেছিল। যেমন : রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ চন্দ্র রায় ও মৌলাবক্স এর নাম উল্লেখযোগ্য। বালক রবীন্দ্রনাথ বাড়ির এই সঙ্গীত চর্চার পরিবেশের সকলের সান্নিধ্যে এসে তাঁর গানের ডালাকে বিচিত্রতায় পরিপূর্ণ করতে পেরেছিলেন। বাল্যকালে অনেকের কাছে সঙ্গীত শিক্ষার সুযোগ হলেও তাঁর প্রকৃত সঙ্গীত গুরু ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, যিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের

পরম সুহৃদ। বাল্যকাল থেকে শুরু করে দাদার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁরই কাছে কার্যকর ভাবে সঙ্গীতের শিক্ষানবিশী করেছেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন-

"সাহিত্যের শিক্ষায়, ভাবের চর্চায়, বাল্যকাল হইতে জ্যোতিদাদা আমার প্রধান সহায়ক ছিলেন। তিনি নিজে উৎসাহী এবং অন্যকে উৎসাহ দিতে তাঁহার আনন্দ। আমি অবাধে তাঁহার সঙ্গে ভাবের ও জ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতাম; তিনি বালক বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিতেন না।"[৮]

সঙ্গীত রচনায় রবীন্দ্রনাথ সুরের ক্ষেত্রে যে সকল পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন, সবগুলোতে পথপ্রদর্শক ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। যেমন-

"বাংলা গানে ইংরেজি সুর ও রীতির প্রবর্তন, গীতিনাট্য রচনা, উদ্দীপক সুরের প্রচলন, রাগরাগিণীর মিশ্রণে নূতন সুররচনা, বিভিন্ন ভাষার গানের সুরে উচ্চাঙ্গের বাংলা গান রচনা, নূতন ছন্দ প্রবর্তন, লয় নির্দেশে নূতন প্রণালীর সূচনা, গীতিরীতিতে বৈচিত্র্য- সম্পাদন- প্রতি ক্ষেত্রেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শুভ সূচনা করিয়া গিয়াছিলেন।"[৯]

কবি ধ্রুপদ গান রচনার ক্ষেত্রে দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুসরণ করেছিলেন। অনেক গানের ক্ষেত্রে উভয় রচয়িতার যথেষ্ট মিল রয়েছে। যেমন : জ্যোতিরিন্দ্রিনাথের রচিত 'গাও রে পরব্রহ্মের মহিমা' গানের সঙ্গে তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের রচিত 'ডাকো রে মুখ চন্দ্রমা'। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সবসময় কনিষ্ঠ ভ্রাতার সাঙ্গীতিক প্রতিভার স্বাভাবিক স্ফুরণকে বাধা না দিয়ে স্বাধীনভাবে তাকে পরিণতির পথে এগিয়ে দিতে সাহায্য করেছেন। ঠাকুর বাড়িতে ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার জন্যও শিক্ষক নিযুক্ত থাকত। স্কুলে তাঁদের যা পাঠ্য ছিল তার থেকে বাড়িতে অনেক বেশি পড়তে হত। রবীন্দ্রনাথ *জীবনস্মৃতিতে* বলেন-

"ভোরে অন্ধকার থাকিতে উঠিয়া লংটি পরিয়া প্রথমেই এক কানা পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি করিতে হইত। তাহার পরে সেই মাটিমাখা শরীরের উপরে জামা পরিয়া পদার্থবিদ্যা, মেঘনাদবধকাব্য, জ্যামিতি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল শিখিতে হইত। স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিলেই ড্রইং এবং জিম্‌নাস্টিকের মাস্টার আমাদিগকে লইয়া পড়িতেন। সন্ধ্যার সময় ইংরেজি পড়াইবার জন্য অঘোরবাবু আসিতেন। এইরূপে রাত্রি নটার পর ছুটি পাইতাম।"[১০]

বাড়িতে শিক্ষক রেখে যেমন প্রথাগত শিক্ষার শুরু হয় তেমনি পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্কুলে ভর্তি হয়েও শিক্ষা গ্রহণ চলতে থাকে। বয়স অনুপাতে কবিগুরুর কল্পনাশক্তি ও বোধশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। শিশুকাল থেকেই তিনি পদ্যরচনা করতেন। দাদাদের সাথে গলা মিলিয়ে গান করতেন আবার একটু বড় হয়ে সুরও করে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিশুকাল থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন এবং তাঁর জীবনদৃষ্টিও ছিল বেশ প্রখর। তাঁর প্রমাণ যৌবনের লেখা একটি পত্রের মধ্যে পাই, শৈশবের কথা তিনি লিখেছিলেন এভাবে-

"মনে আছে এক-একদিন সকালবেলায় অকারণে অকস্মাৎ খুব একটা জীবনানন্দ মনে জেগে উঠত। তখন পৃথিবীর চারি-দিক রহস্যে আচ্ছন্ন ছিল।... গোলাবাড়িতে একটা বাখারি দিয়ে রোজ রোজ মাটি খুঁড়তুম, মনে করতেম কি একটা রহস্য আবিষ্কার হবে। দক্ষিণের বারান্দার কোণে খানিকটা ধুলো জড় করে তার ভিতর কতগুলো আতার বিচি পুঁতে রোজ

যখন-তখন জল দিতেম ভাবতেম এই বিচি অঙ্কুরিত হয়ে উঠলে সে কি একটা আশ্চর্য ব্যাপার হবে। পৃথিবীর সমস্ত রূপ-রস-গন্ধ, সমস্ত নড়াচড়া আন্দোলন- বাড়ির ভিতরের বাগানের নারিকেল গাছ, পুকুরের ধারের বট, জলের উপকার ছায়ালোক, রাস্তার শব্দ, চিলের ডাক, ভোরের বেলাকার বাগানের গন্ধ, ঝড়বাদলা- সমস্ত জড়িয়ে একটা বৃহৎ অর্ধপরিচিত প্রাণী নানা মূর্তিতে আমায় সঙ্গ দান করত।"[১১]

বয়সবৃদ্ধির সাথে সাথে এই বোধের মাত্রায় নতুন নতুন উপলব্ধি যুক্ত হয়ে নতুন ভাবনার সঞ্চার ঘটে। ১৮৭৩ সালে মাঘোৎসবের পক্ষকাল পরে রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন হয়। তখন তাঁর বয়স এগার বৎসর নয় মাস। উপনয়নের পর মুণ্ডিত মস্তকে তিনি কীভাবে বিদ্যালয়ে যাবেন তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়লেন। সে সময় খবর পেলেন পিতা তাঁকে নিয়ে হিমালয় যাত্রা করবেন। বিদেশ যাত্রা কবির জীবনে এই প্রথম তাই আনন্দের মাত্রার শেষ ছিল না। হিমালয় যাত্রার শুরুতে তাঁদের কিছুদিন বোলপুরে থাকা হয়েছিল। *জীবনস্মৃতিতে* তিনি বলেন-

"আমরা শহরের ছেলে, কোনোকালে ধানের খেত দেখি নাই এবং রাখাল-বালকের কথা বইয়ে পড়িয়া তাহাদিগকে খুব মনোহর করিয়া কল্পনার পটে আঁকিয়াছিলাম।..... ব্যাকুল হইয়া চারিদিকে চাহিলাম... যাহা দেখিলাম তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইল। এখানে চাকরদের শাসন ছিল না। প্রান্তরলক্ষ্মী দিক্‌চক্রবালে একটিমাত্র নীল রেখার গণ্ডি আঁকিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাতে আমার অবাধসঞ্চরণের কোন ব্যাঘাত করিত না।"[১২]

বোলপুরে শান্তিনিকেতনে আসা কবির জীবনে একটি বিশেষ ঘটনা। তিনি বলেছেন-

"শান্তিনিকেতনে এসেই আমার জীবনে প্রথম ছাড়া পেয়েছি বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে। উপনয়নের পরেই আমি এখানে এসেছি।... আমার জীবন নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকত প্রথমবয়সে এই সুযোগ যদি আমার না ঘটত।... সেই বালকবয়সে এখানকার প্রকৃতির কাছ থেকে যে আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম- এখানকার অনবরুদ্ধ আকাশ ও মাঠ, দূর হতে প্রতিভাত নীলাভ শাল ও তাল-শ্রেণীর সমুচ্চ শাখাপুঞ্জের শ্যামলা শান্তি স্মৃতির সম্পদ্‌রূপে চিরকাল আমার স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তার পরে এই আকাশে এই আলোকে দেখেছি সকালে-বিকালে পিতৃদেবের পূজার নিঃশব্দ নিবেদন, তার গভীর গাম্ভীর্য।"[১৩]

বোলপুরেই পিতার সাথে পুত্রের প্রবীণ সাধকের সাথে কিশোর শিল্পীর যেন প্রথম ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। বালক কবি নির্জন প্রান্তরে বাসকালে পিতার বিধিকার্যে সহায়তায় আত্মগৌরব বোধ করেছিলেন।

কবির প্রতি পিতার প্রচুর দায়িত্ব ও অগাধ বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে তাঁকে সম্মানিত করেছিলেন। পরবর্তীতে এই বোলপুরের শান্তিনিকেতনের ভার পিতার কাছ থেকে গ্রহণ করে কবি পিতার স্বপ্নপূরণ করেছিলেন। পরবর্তী সময়গুলোতে শান্তিনিকেতনেই রবীন্দ্রনাথের জীবনের কর্মকেন্দ্র ও সাধনপীঠ হয়। বাল্যকালের কবি এই স্থানকে যেভাবে দেখেছেন তা পূর্বে উল্লিখিত জীবনস্মৃতির দু'টি উদ্বৃতি থেকে বোঝা যায়। কবি পরবর্তীতে মনে করতেন বাল্যকালে বিশ্বপ্রকৃতির এই রূপের সাথে পরিচয় না ঘটলে জীবন অসম্পূর্ণ থাকত। বোলপুরে কিছুদিন থাকবার পর সাহেবগঞ্জ দানাপুর, এলাহাবাদ, কানপুর প্রভৃতি স্থানে মাঝে মাঝে যাত্রাবিরতি দিয়ে অমৃতসরে পৌঁছালেন।

এখানে মাস তিনেক থাকার পর হিমালয়ে পৌঁছালেন। পিতার সহিত কবির হিমালয় ভ্রমণ বাল্যজীবনে তাঁর অধিক স্মরণীয় ঘটনা। তিনি বলেছেন-

"পূর্বে যে- শাসনের মধ্যে সংকুচিত হইয়া ছিলাম হিমালয় যাইবার সময়ে তাহা একেবারে ভাঙিয়া গেল। যখন ফিরিলাম তখন আমার অধিকার প্রশস্ত হইয়া গেছে। বাড়িতে যখন আসিলাম তখন কেবল যে প্রবাস হইতে ফিরিলাম তাহা নহে- এতকাল বাড়িতে থাকিয়াই যে-নির্বাসনে ছিলাম সেই নির্বাসন হইতে বাড়ির ভিতরে আসিয়া পৌঁছালাম। অন্তঃপুরের বাধা ঘুচিয়া গেল, চাকরদের ঘরে আমার আর কুলাইল না। মায়ের ঘরের সভায় খুব একটা বড় আসন দখল করিলাম। তখন আমাদের বাড়ির যিনি কনিষ্ঠ বধু (কাদম্বরী দেবী) ছিলেন তাঁহার কাছ হইতে প্রচুর স্নেহ ও আদর পাইলাম।"[১৪]

হিমালয় প্রত্যাবর্তনের পরে বালক কবির স্কুলের গণ্ডির মধ্যে মন টিকতে চায় না। মহর্ষি গৃহ শিক্ষক হিসাবে জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যকে নিযুক্ত করলেন। তিনি যখন রবীন্দ্রনাথকে স্কুলের পড়ায় মন বসাতে পারলেন না তখন তাঁহার রুচিমত সাহিত্যরস পরিবেশনে মন দিলেন। তিনি কালিদাসের কুমারসম্ভব মহাকাব্য ও ইংরেজিতে শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ নাটক পড়ানো শুরু করলেন। এই দুটি কাব্য বালক রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে দু'টি নতুন জগৎ আবিষ্কার করল- একটি প্রকৃতির সৌন্দর্য অপরটি মানবচরিত্রের বৈচিত্র্য।

শৈশবে পিতার সাথে বোলপুরে শান্তিনিকেতনে আগমন এবং হিমালয় যাত্রা এক বিশেষ ঘটনা হিসাবে তাঁর স্মৃতির পাতায় রয়ে গেছে। তিনি পরবর্তীতে মনে করতেন প্রথম বয়সে বিশ্বপ্রকৃতির এই রূপের সাথে পরিচয় না ঘটলে জীবন অসম্পূর্ণ থাকত। এইসময় একটি বিষয় উল্লেখ করে রাখা প্রয়োজন, ১০ই মার্চ ১৮৭৫ সালে যখন রবীন্দ্রনাথের বয়স মাত্র চৌদ্দ বছর তখন তাঁর মাতৃবিয়োগ ঘটে। ফলে বাড়ির অন্তঃপুরে মাতৃহীন বালক বলে বিশেষ প্রশ্রয় পাওয়াতে স্কুল যাওয়া প্রায় ছেড়ে দিলেন কিন্তু সাহিত্য সাধনা সাধ্যমত চলতে থাকে। সেই সাথে জ্যোতি দাদার স্ত্রী কাদম্বরী বৌঠান যিনি সাহিত্য চর্চায় বিশেষ আগ্রহী ছিলেন ও সমঝদার ছিলেন, তাঁর সাথে বালক কবির সখ্যতা গড়ে ওঠে। কবিগুরুর সাহিত্য রচনায় উৎসাহ দাতা এবং মনোযোগ দিয়ে সেটা পড়ে ও সমালোচনায় পরবর্তীতে তিনি বিশেষ ভূমিকা রাখেন।

জন্মগত উচ্চ-আভিজাত্য, ঠাকুরবাড়ির অভিজাত জীবনাচার, ব্রাহ্ম ধর্মদর্শন, উপনিষদীয় প্রতীতি ও প্রাশ্চাত্য চিন্তাস্রোতকে স্বীকার করে রবীন্দ্রনাথ প্রতিনিয়ত রূপান্তরিত হয়েছেন এবং পরিশেষে সুস্থিত হয়েছেন প্রগতিশীল সমাজচেতনা ও বিশ্ব মানবমুক্তির সর্বজনীন দার্শনিক প্রত্যয়ে। তাঁর দীর্ঘ আশিবছরের জীবনবৃত্তে তিনি বিচিত্র চিন্তা, নানান আদর্শ এবং বৈচিত্র্যময় দার্শনিক প্রত্যয়ে অবিরল বিচরণ করলেও রবীন্দ্রনাথের সকল চিন্তা ও কর্মের কেন্দ্রস্থ ও প্রাণশক্তি ছিল মানবকল্যাণ দর্শন। এই দর্শনই পরবর্তীতে রবীন্দ্রভাবনায় রূপ নিয়েছিলো বিশ্বায়নের চেতনায়। সেই সাথে রবীন্দ্রনাথের প্রেমচেতনা ও বিরহ-অনুভূতি যে তাঁর জীবনার্থেরই সমার্থক এবং তা জীবনদর্শনেরই ভিন্ন এক শাব্দিক প্রকাশ।

১২৮৩ সালের কার্তিক মাসে মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে *জ্ঞানাঙ্কুর* পত্রিকায় গ্রন্থসমালোচনা প্রসঙ্গে কবি লিখেছিলেন- "গীতিকাব্য আমরা নিজের জন্য রচনা করি। যখন প্রেম করুণা ভক্তি প্রভৃতি বৃত্তিসকল হৃদয়ের গূঢ় উৎস

হইতে উৎসারিত হয়, তখন আমরা হৃদয়ের ভার লাঘব করিয়া তাহা গীতিকাব্যরূপ স্রোতে ঢালিয়া দিই।"[১৫] রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর ভক্তি বা মানব প্রেমের অঙ্গাঅঙ্গি যোগসাধন পাই তাঁর কবি জীবনে। সঙ্গীতেও দেবতা কিংবা মানব একই বৃন্তে মিলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কবিজীবনের শুরুর দিকে যে ধর্ম সঙ্গীতগুলো রচনা করেছিলেন সেখানে অপরিণত চিত্তের হৃদয়াবেগ, পরোক্ষ অনুভূতি ও কৌতুহলের প্রকাশ পেয়েছে। পূজাপর্যায়ের গানগুলোতে প্রথম পর্যায়ে (১৮৮১-১৯০০) সরাসরি ঈশ্বরকে সম্বোধন করেছেন করুণা চেয়েছেন। যেমন : ১৮৮১ সালে পূজা ও প্রার্থনা পর্যায়ের একটি গান-

মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ, হে বিশ্বপিত
তোমারি রচিত ছন্দে মহান্ বিশ্বের গীত॥
মর্তের মৃত্তিকা হয়ে ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ লয়ে
আমিও দুয়ারে তব হয়েছি হে উপনীত॥
কিছু নাহি চাহি, দেব, কেবল দর্শন মাগি
তোমারে শুনাব গীত, এসেছি তাহারি লাগি।
গাহে যেথা রবি শশী সেই সভামাঝে বসি
একান্তে গাহিতে চাহে এই ভকতের চিত॥

সমগ্র পৃথিবীকে ঈশ্বর একটি নিজস্ব ছন্দে 'বিশ্বপিত' রূপে পরিচালিত করছেন। কবি নিজেকে ক্ষুদ্র ভেবে বিশ্বপিতার কাছে করুণা প্রাপ্তির আকুতি জানিয়েছেন। উল্লিখিত গানটিতে কবি নিজেকে ক্ষুদ্র ভেবে বিশ্বপিতার কাছে করুণাপ্রাপ্তির আকুতি জানিয়েছেন। সৃষ্টির ছন্দে ও সুরে কবির চিত্তে যে সুরের উদয় হয় তা শোনাবার জন্য সৃষ্টিকর্তার দর্শন চেয়েছেন। কবিচিত্ত একান্তে বিশ্বপিতকে তাঁর নিজস্ব সুরের সৃষ্টি শোনাবার চেষ্টায় মগ্ন। বয়সের পরিপক্কতার সাথে তাঁর অনুভূতির ও ঈশ্বরচেতনারও পরবর্তীতে পরিবর্তন ঘটে। যা সঙ্গীতে দেবতা ও মানবপ্রেমের পারস্পরিক মিলন ঘটিয়ে এক অতুলনীয় অনুভূতির প্রকাশ ঘটায়। কবি মনে করেন, বেদনার মধ্য দিয়ে সৃষ্টিকর্তার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ পায়। তিনি শুধু আনন্দরসঘনরূপে বিরাজমান নন, তিনি গভীর দুঃখরাতে, সংকটে রাজা হয়েও আমাদের মাঝে আসেন। যেমন : ১৯১৮ সালে রচিত পূজাপর্যায়ের একটি গান-

আজি বিজন ঘরে নিশীথরাতে আসবে যদি শূন্য হাতে-
আমি তাইতে কি ভয় মানি!
জানি জানি, বন্ধু, জানি-
তোমার আছে তো হাতখানি ॥

আবার ১৯১৯ সালে রচিত পূজাপর্যায়ের গান 'আমি যখন ছিলেম অন্ধ' এর শেষ চার চরণে কবি প্রকাশ করেন- সুখের সন্ধানে যখন কবির বেলা গেছে তখন তিনি যেন সেই আনন্দ উপভোগ করতে পারেন নি। কিন্তু ঈশ্বর

যখন অগ্নিবেশে কবির সবকিছু নিয়ে নিলেন সেদিনই যেন তিনি পূর্ণ হলেন। অর্থাৎ জীবনব্যাপী সুখ প্রাপ্তির এই যে প্রবহমান আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে কবি তাঁর আনন্দ খুঁজতে গিয়ে হতাশ হয়েছেন। কবির মনে দ্বন্দ্ব যেন দূর হয় তখন, যখন ঈশ্বরের অগ্নিবেশে আগমন ঘটে। তিনি উপলব্ধি করেন 'সুখ ও দুঃখ' এই দুইয়ের পারাবারেই জীবনের আনন্দ। কবি তাঁর এই অনুভূতি প্রকাশ করেছেন এভাবে-

যেদিন তুমি অগ্নিবেশে
সব-কিছু মোর নিলে এসে,
সে-দিন আমি পূর্ণ হলেম ঘুচল আমার দ্বন্দ্ব,
দুঃখসুখের পারে তোমায় পেয়েছি আনন্দ।

পরিণত বয়সে (১৯২১-১৯৩৯) এসে কবি ঈশ্বরকে যেভাবে অনুভব করেন তা যেন এক প্রশান্তির অনুভূতি। মৃত্যুর সুস্থির আলোয় কবি ঈশ্বরকে বন্ধুরূপে পেয়েছেন। যেমন : ১৯২৪ সালে রচিত পূজাপর্যায়ের গান-

জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে
বন্ধু হে আমার, রয়েছ দাঁড়ায়ে।

কবি নিজের চিন্তাকে কখনই একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখেননি। তিনি ১৯৩৯ সালে রচিত আনুষ্ঠানিক পর্যায়ের গানে বলেছেন তাঁর সামনে 'শান্তিপারাবার'। সেই মহা-পারাবারকে পৃথিবীর সকল প্রকার বন্ধনমুক্ত কবি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন মৃত্যুর আভাস। তাই মৃত্যুর পরবর্তী ইহলোক থেকে পরলোকে যে স্থান বদল, সেই পথকে তিনি 'শান্তিপারাবার' বলে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছেন। কারণ, তিনি মনে করেছিলেন ঈশ্বর তাঁর মহা-অজানার চিরসাথী হয়ে থাকবে। যেমন-

সমুখে শান্তিপারাবার-
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।
তুমি হবে চিরসাথি, লও লও হে ক্রোড় পাতি-
অসীমের পথে জ্বলিবে জ্যোতি ধ্রুবতারকার ॥ ...

কবির অন্তরে ঈশ্বর আরাধনা যেন এমন-

"আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট'- তিনি সর্বজনীন, তিনি সর্বকালীন মানব...। সেই মানুষের উপস্থিতিতেই মানুষ আপন জীবসীমা অতিক্রম করে মানব-সীমায় উত্তীর্ণ হয়।... তাঁর আকর্ষণ নিয়ত মানুষের অন্তর থেকে কাজ করেছে বলেই আত্মপ্রত্যাশায় ও প্রয়াসে মানুষ কোথাও সীমাকে স্বীকার করছে না।"[১৬]

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনায় তাঁর সকল পর্যায়ের গানে মানব, ঈশ্বর ও প্রকৃতি এই ত্রয়ীর অনন্য সহাবস্থানে সুষম শিল্পরূপ প্রকাশ পায়। পূজার গান প্রেমে, প্রেমের গান প্রার্থনায় রূপান্তরিত হয়। প্রকৃতি পর্যায়ের গানেও সেই একই অনুভূতির প্রকাশ পায়। প্রকৃতি প্রেমে কবি আদ্যন্ত রোমান্টিক। যার প্রকাশ বিভিন্ন ঋতুর বিচিত্র রূপ

কল্পনায় আমরা দেখতে পাই। তবে কবির শেষ কুড়ি বছর বয়সের গানে মানব, ঈশ্বর ও প্রকৃতির সহাবস্থান বিশেষ ভাবে শ্রোতার কাছে প্রকাশ পায়। যেমন : ১৯২৩ সালে রচিত বসন্ত উপ-পর্যায়ের গান-

যদি তারে নাই চিনি গো সে কি আমায় নেবে চিনে
এই নব ফাল্গুনের দিনে- জানি নে জানি নে ॥
সে কি আমার কুঁড়ির কানে কবে কথা গানে গানে,
পরান তাহার নেবে কিনে এই নব ফাল্গুনের দিনে-
জানি নে, জানি নে ॥...

কবিকে কেউ ফাল্গুনের দিনে চিনে নেবে এমন আকুলতা প্রকাশ মানব না ঈশ্বর তা একমাত্র কবিই জানেন। আবার শেষ বয়সে নিজেকে তুলনা করেছেন ফাল্গুনের ঝরা পাতার সাথে। কারণ কচি সবুজ পাতা যখন বসন্তী রঙে রঙিন হয় তখনই পাতা ঝরার সময় হয়। এসময় পাতার বিদায় মন্ত্রের যে সুর বাজে, তা ১৯৩১ সালে রচিত গানটিতে কবির নিজের বিদায়মন্ত্রের আভাস যেন পেয়েছিলেন এভাবে-

ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে।
অনেক হাসি অনেক অশ্রুজলে
ফাগুন দিল বিদায় মন্ত্র আমার হিয়াতলে ॥...
... তোমারি মতো আমারো উত্তরী
আগুন-রঙে দিয়ো রঙিন করি
অন্তরবি লাগাক পরশমণি
প্রাণের মম শেষের সম্বলে ॥

প্রকৃতি পর্যায়ে ছয়টি ঋতুর মধ্যে বর্ষা ঋতুর গানের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি (১১৫টি)। ১৯৩৩ সালে বর্ষা উপ-পর্যায়ের গানে দেখা যায় শ্রাবণপ্রাতে কবি বন্ধুকে সাথে থাকবার আহ্বান করেছেন-

বন্ধু, রহো রহো সাথে
আজি এ সঘন শ্রাবণপ্রাতে
ছিলে কি মোর স্বপনে সাথিহারা রাতে ॥
বন্ধু, বেলা বৃথা যায় রে-
আজি এ বাদলে আকুল হাওয়ায় রে-
কথা কও মোর হৃদয়ে, হাত রাখো হাতে ॥

মানব, ঈশ্বর ও প্রকৃতির মিশ্রণে কবিগুরুর সকল পর্যায়ের গানেই, 'প্রেম' ও 'বিশ্বানুভূতি' একটি প্রধান অনুভূতি, যা *গীতবিতানে* সকল পর্যায়ের গানে নানান বৈচিত্র্যে প্রকাশ ঘটেছে। তিনি দুঃখ বা বিরহবোধকে সম্বল করে-আনন্দ লাভের সন্ধানে প্রয়াস করেছেন। তাইতো রবীন্দ্র গবেষক বলেছেন-

"এখানে এক মুহূর্ত দ্বিধা না করেই বলা যায়, প্রেমসংগীতের রবীন্দ্রনাথ প্রথমোক্ত পর্যায়ে বিশ্বনাগরিক। নিজের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসার তাগিদেই তিনি ভালোবাসার গান লিখেছেন, পথ কেটেছেন তার হৃদয়ে, যেখানে তার সম্পূরক আরেকটি উপস্থিতির চরণ পড়ে।"[১৭]

মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে তিনি স্পষ্টত বলেছেন প্রেম, করুণা বা ভক্তি যেকোনো গভীর হৃদয়ভাবের সফল বহিঃপ্রকাশই গানের কথায়। তাই প্রথম জীবনে ধর্ম-সঙ্গীতে যে অপরিপক্ক অনুভূতি ছিল তার থেকেও কিশোর ও অপরিণত যৌবনকালের রচিত প্রেম-সঙ্গীত গুলোতে তাঁর কবিজীবনের যথার্থ প্রকাশ ঘটে। তাই প্রেমভাবনার আলোচনায় কবিজীবনের প্রথম জীবনের কাব্যগুলির আলোচনা অপরিহার্য। কাব্যগুলি হলো- *কবিকাহিনী* (১৮৭৮ নভেম্বর), *বনফুল* (১৮৮০ মার্চ), *ভগ্নহৃদয়* (১৮৮১ জুন), *রুদ্রচণ্ড* (১৮৮১ জুন), *নলিনী* (১৮৮৪ মে), *মায়ার খেলা* (১৮৮৮ ডিসেম্বর) প্রভৃতি নাট্য সৃষ্টিগুলির বিষয়বস্তু ছিল নরনারীর অব্যক্ত হৃদয়াবেগের প্রকাশ। এছাড়াও *সান্ধ্যসংগীত* (১৮৮২ জুলাই), *প্রভাতসংগীত* (১৮৮৩ মে), *শৈশবসংগীত* (১৮৮৪ মে), *কড়ি ও কোমল* (১৮৮৬ নভেম্বর) এবং *মানসী* (১৮৯০ ডিসেম্বর) কাব্যগুলির বেশিরভাগ কবিতাই প্রেমের।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমপর্যায়ের কিংবা অন্যান্য পর্যায়ের গানের যে প্রেমভাবনা তা যেমন ব্যক্তিগত অনুভূতির ক্রিয়া আবার সব গানেই কোনো মানসী মূর্তির অন্বেষণ অপরিহার্য হয়ে ওঠে না। শেষ বয়সের রচিত গানগুলোতে দেখা যায় জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার অতি সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্মতর অনুভূতিগুলোর কল্পনার রূপান্তর। কবির সৃষ্টির কল্পলোকে প্রবেশ করে ব্যক্তি জীবনের সূত্র না খোঁজাই শ্রেয়। যেমন : প্রেমপর্যায়ের একটি গান-

সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে
দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে ॥
এ কথা কভু আর পারে না ঘুচিতে,
আছে সে নিখিলের মাধুরীরুচিতে।
এ কথা শিখানু যে আমার বীণারে,
গানেতে চিনালেম সে চির-চিনারে ॥ ...

বয়স : ৬৯

বয়সের পরিণতির সাথে প্রেম-মানসী থেকে প্রকৃতি ও বিশ্বপ্রেমে রূপান্তরিত হয়েছে। সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে পথে যেতে যেতে কবি যে তুলনাহীনারে দেখতে পেরেছিলেন সে তো কল্পনায় প্রকৃতির মানসমূর্তি। এই তুলনাহীনার মধ্যেই বর্তমান, ভূত-ভবিষ্যৎ, কে আছে বা নাই তা কি বলতে পারি আমরা। কারণ পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য, আকাশের আলো আঁধারি রূপ, সাগরের উচ্ছ্বল তরঙ্গ, বাউল বাতাসের উদ্দামতা, ফেলে আসা ভালোবাসার স্মৃতি ইত্যাদি এ সকলই যে তুলনাহীনার কায়া ধরেনি এ কথা আমরা স্পষ্ট করে বলতে পারবো না। কবির আরও একটি প্রকৃতি পর্যায়ের গানে বর্ষায় প্রিয়ার রূপটি বর্ণনা করেছেন এভাবে-

আমার প্রিয়ার ছায়া

আকাশে আজ ভাসে, হায় হায়!

বৃষ্টিসজল বিষণ্ন নিশ্বাসে, হায় ॥

আমার প্রিয়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে

সন্ধ্যাতারায় লুকিয়ে দেখে কাকে,

সন্ধ্যাদীপের লুপ্ত আলো স্মরণে তার আসে, হায় ॥..

বয়স : ৭৭

বর্ষার আরও একটি গান উদাহরণ হিসেবে দেখি-

বাদল-দিনের প্রথম কদম ফুল করেছ দান

আমি দিতে এসেছি শ্রাবণের গান ॥

মেঘের ছায়ায় অন্ধকারে রেখেছি ঢেকে তারে

এই-যে আমার সুরের ক্ষেতের প্রথম সোনার ধান ॥ ...

বয়স : ৭৮

আবার প্রকৃতি ও প্রেমপর্যায়ের একটি গান-

হিয়ামাঝে গোপনে হেরিয়ে তোমারে

ক্ষণে ক্ষণে পুলক যে কাঁপে কিশলয়ে

কুসুমে কুসুমে ব্যথা লাগে ॥

বয়স : ৬১

উল্লিখিত গানগুলোতে প্রিয়া কিংবা ভালোবাসার মানুষটির উপস্থিতি কবি প্রকৃতির মাঝে খুঁজে ফিরছেন, ব্যথা অনুভব করছেন। আবার বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল কার হাত দিয়ে নিয়েছেন তা আমরা বলতে পারব না। শুধুই ধারণা করতে পারি নিশ্চয়ই সে তাঁর আপনজন। যাদের অনুপস্থিতি বা স্মৃতি পরিণত বয়সে কবিকে ভাবিয়ে তুলেছিল। তাঁদের অনুভব তিনি প্রকৃতিতে খুঁজে ফিরতেন। কৈশোর বা যৌবনের প্রেমভাবনা কবির ছিল স্পষ্ট। পাওয়া না পাওয়ার আনন্দ ও দুঃখবোধ তিনি নানা পর্যায়ের গানে সাবলীলভাবে প্রকাশ করেছেন। যেমন :

"প্রথম জীবনের ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রেমানুভূতি- সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু দাদোবা পাণ্ডুরঙ্গের বিলাত-ফেরত কন্যা ছিলেন আন্না তরখড় (Anna)। কবির থেকে কিছুটা বয়সে বড় এই সুন্দরী যুবতী কবির কবিতার ও গানের ভক্ত ছিলেন। কবির কাছ থেকে তিনি ডাকনাম চেয়েছিলেন একদিন তখন কবি তাঁর নাম দেন 'নলিনী'।"[১৮]

কবির রচনায় বেশ কয়েকটি কবিতায় এমন কি গানেও এই 'নলিনী' নামটি পাওয়া যায়। যেমন : একটি গান -

শুন নলিনী, খোলো গো আঁখি

ঘুম এখনো ভাঙিল না কি!

দেখো, তোমারি দুয়ার-' পরে

সখী এসেছে তোমারি রবি ॥

কবি দিলীপকুমারকে পত্রালাপে বলেছিলেন-

"সে মেয়েটিকে আমি ভুলি নি বা তার সে-আকর্ষণকে কোনো লঘু লেবেল মেরে খাটো করে দেখি নি কোনোদিন। আমার জীবনে তার পরে নানান্ অভিজ্ঞতার আলোছায়া খেলে গেছে- বিধাতা ঘটিয়েছেন কত যে অঘটন- কিন্তু আমি একটা কথা বলতে পারি গৌরব ক'রে যে, কোনো মেয়ের ভালোবাসাকে আমি কখনো ভুলেও অবজ্ঞার চোখে দেখি নি- তা সে ভালোবাসা যে রকমই হোক-না কেন।"[১৯]

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রিয়ার এমন নিজস্ব বক্তব্য আমরা পেয়েছি রবিজীবনীতে। কবি নলিনীকে নিয়ে লিখেছেন গান, কবিতা। সতেরো বছর বয়সে নলিনীর মুগ্ধতা কখনও তির্যক ইঙ্গিতে, কখনো স্পষ্ট স্বীকারোক্তির ঢঙে, কৈশোরের এই প্রেম ফিরে পাওয়া যায় তাঁর পরবর্তী বিভিন্ন সময়ের লেখায়। যেমন : তীর্থঙ্কর গ্রন্থে দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে আলোচনায় কবি তাঁর এই প্রণয় সম্পর্কের আরও গভীর বিবরণ দিয়েছেন এভাবে-

"আমাদের ঐ বটগাছটাতে কোনো কোনো বছরে হঠাৎ বিদেশী পাখি এসে বাসা বাঁধে। তাদের ডানার নাচ চিনে নিতে নিতেই দেখি তারা চলে গেছে। তারা অজানা সুর নিয়ে আসে দূরের বন থেকে। তেমনি জীবনযাত্রার মাঝে মাঝে জগতের অচেনা মহল থেকে আসে আপন-মানুষের দূতী, হৃদয়ে দখলের সীমানা বড়ো করে দিয়ে যায়। না ডাকতেই আসে, শেষকালে একদিন ডেকে আর পাওয়া যায় না। চলে যেতে যেতে বেঁচে-থাকার চাদরটার উপরে ফুলকাটা কাগজের পাড় বসিয়ে দেয়, বরাবরের মতো দিনরাত্রির দাম দিয়ে যায় বাড়িয়ে।"[২০]

১৮৭৯ সালে আঠারো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ লন্ডনে স্কট পরিবারের অতিথি ছিলেন। স্কট পরিবারের চার মেয়ের মধ্যে লুসির সঙ্গে কবির সুসম্পর্ক ছিল। লুসি পিয়ানো বাজাতে পারতেন। কবি যখন গান করতেন তখন লুসি পিয়ানো বাজাতেন। তাঁর অলীক প্রতিভার রসায়ন অনর্গল মিশিয়ে দিত বাংলা শব্দকে বিলিতি সুরের সঙ্গে। যেমন : তেমনি একটি গান-

ফুলে ফুলে ঢ'লে ঢ'লে বহে কিবা মৃদু বায়,
তটিনী হিল্লোল তুলে কল্লোলে চলিয়া যায়।
পিক কিবা কুঞ্জেকুঞ্জে কুহু কুহু কুহু গায়
কী জানি কিসেরই লাগি প্রাণ করে হায়-হায় ॥

রবীন্দ্রনাথ স্বভাবে ছিলেন ইনট্রোভার্ট। লুসি স্কট ছাড়াও আরও তিন বিলেতি মিস লং, মিস ভিভিয়ান ও মিস মূল কিশোর কবির প্রতিভা, সৌন্দর্য এবং সৌজাত্যের টানে মুগ্ধ ছিল। কিন্তু তাঁদের এই মুগ্ধতায় কবি দ্বিধান্তিত থাকতেন, কারণ তাঁর সামাজিক আড়ষ্টতা, পরিবারিক মূল্যবোধ ও আভিজাত্যের দূরত্বে। পরবর্তীতের রবীন্দ্রনাথ মনে রেখেছিলেন তাঁর কৈশোরের ভালোলাগার সঙ্গিনী আনা, লুসি, লং, মূল এবং ভিভিয়ানদের। তাঁরা ফিরে এসেছিলেন তার শেষ বয়সের কবিতাতে। কৈশোরের প্রেমানুভূতি ছিল কবির লেখাতে সারা জীবনের সম্পদ ও সৌরভ। অনভিজ্ঞ কৈশোরের অব্যক্ত প্রেম কিংবা প্রেমিকাদের কথা তাঁর মনে পড়েছে নানান উপমায়।

ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ বা তাঁর জীবন সম্পর্কে না জানলে মনে হবে, কবিগুরুর প্রেমের গানগুলোর কথা ও সুরের নিবেদন যেন যে কোন প্রেমিক পাত্র-পাত্রীর একান্ত মনের অনুভূতি। তাঁর জীবনবোধ ও প্রেমভাবনা একটি বৃক্ষের মত চারা থেকে লালিত হয়ে একটি বটবৃক্ষে পরিণত হয়েছে, ফলে মানব মনের কোন অব্যক্ত অনুভূতিই যেন বাদ পড়ে না। তারপর আসি নতুন বৌঠান কাদম্বরীর কথায়। আলোচনার শুরুতে কবির অল্পবয়সে মায়ের মৃত্যুর কথা বলেছি। প্রথমে যখন বৌঠান আসেন বাড়িতে, তখন তিনি ছিলেন নয় বছরের বালিকা বধূ আর সাত বছরের বালক রবি ছিলেন তাঁর খেলার সাথী গল্পের সঙ্গী। কাদম্বরী দেবীর নারী হৃদয়ের সকল আবেগ, স্নেহ, মমতা ছিল রবিকে ঘিরে ।

কিশোর বয়সে দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তাঁর পত্নী কাদম্বরী বৌঠানের নিকট রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন অযাচিত 'প্রেম ও প্রশ্রয়'। পরবর্তীতে এই স্নেহ কবির কাব্য জীবন গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বাড়িতে বালক কবির কাব্য জীবন গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বাড়িতে বালক কবির সাহিত্য সমালোচনায় ও উৎসাহ দানে দু'জনেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। কাদম্বরী দেবী বৌঠান ছিলেন বিহারীলালের ভক্ত তাই তিনি চাইতেন বড় হয়ে রবীন্দ্রনাথ এমন বড় মাপের একজন লেখক হবেন। ১৮৭৮ সালে আঠারো বছর বয়সে কবি প্রায় এক বৎসর পাঁচ মাস বিলেতে থেকে দেশে ফিরলেন। তিনি এমন সময় বিলেত গিয়েছিলেন যেটা না বাল্য, না যৌবন। বালক বেশে গিয়ে তিনি যুবক রূপে ফিরলেন। এ সময় নতুন বৌঠানের বয়স একুশ বছর। দেশে ফিরে তিনি সব থেকে আদর-আপ্যায়ন পেলেন তাঁর নতুন বৌঠানের কাছ থেকে। কাদম্বরী দেবী নিঃসন্তান ছিলেন, তাই তাঁর নারীহৃদয়ের সমস্ত প্রেম-প্রীতি ছিল রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে। তিনি তাঁর নিঃসঙ্গ স্নেহাতুর জীবনে বিলেত ফেরত কবিকে পেয়ে যেমন আনন্দিত হয়েছিলেন তেমনি মাতৃহারা কবিও কম আনন্দিত হননি। কারণ দেখা যায় বিলেতে নতুন বৌঠানের স্নেহময় আঁখিই ধ্রুবতারকার মতন কবির সবচেয়ে বেশি মনে পড়ত। তেমনি জীবন সায়াহ্নে দেখতে পাব তাঁর রচনায় তাঁরই স্মৃতির 'অরূপমূর্তি' ভাস্বর প্রতিরূপ-

"রবীন্দ্রনাথ ১৮৮০ সালে 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যটি উৎসর্গ করেন শ্রীমতি 'হে'- কে। বাহিরের মানুষ না জানলেও ঠাকুরবাড়ির সকলে জানতেন কবি কাকে উৎসর্গ করেছেন কাব্যটি। ইন্দিরাদেবীর নিকট থেকে জানা যায় 'হে' কাদম্বরী দেবীর ছদ্মনামের প্রথম অক্ষর।"[২১]

পুরো কাব্যটিই শ্রীমতি 'হে' কে উৎসর্গ করা হলেও *ভগ্নহৃদয়* কাব্যনাট্যে বিলেত থেকে লেখা প্রথম স্বর্গে 'উপহার' নামে উৎসর্গ গীতিটি *ভারতীতে* (১৮৮০) প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রীমতী 'হে' কে উৎসর্গ করে *ভগ্নহৃদয়* কাব্যনাট্যে প্রথম স্বর্গে প্রকাশিত গান-

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা,
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা ॥
যেথা আমি যাই নাকো তুমি প্রকাশিত থাকো,
আকুল নয়নজলে ঢালো গো কিরণধারা ॥...

এ থেকে বোঝা যায় প্রবাসে থেকেও কবির নতুন বৌঠান কতখানি তাঁর মনে স্থান করেছিল। একবার স্ত্রী কাদম্বরী দেবীকে নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কলিকাতার বাহিরে দূরে বেড়াতে যান। এসময় বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ একাকী কয়দিন থাকায় তিনি দাদা ও বউ-ঠাকুরানীর অনুপস্থিতির অভাববোধ করেছিলেন। জ্যোতিদাদা ও বউ-ঠাকুরানীর কাছে স্নেহ পাওয়াটা কবির এমনি অভ্যাস হয়েছিল যে তাঁদের অভাবটা কবির মনে নানাভাবে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। রবীন্দ্রনাথের এ সময়ে প্রেমবোধ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মতামত ছিল *ছবি ও গান* সম্পর্কে। কারোয়ার থেকে ফিরে তিনি ১৮৮৩ সালে *ছবি ও গান* এর কবিতাগুলো লিখেছেন। পরবর্তীতে তিনি এ সম্পর্কে বলেছেন-

"সত্যি কথা বলতে কি, সেই নবযৌবনের নেশা এখনো আমার হৃদয় মধ্যে লেগে রয়েছে। 'ছবি ও গান' পড়তে পড়তে আমার মন কেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে। এমন আমার কোনো পুরোনো লেখায় হয় না।... আমি সত্যি সত্যি বুঝতে পারিনে আমার মনে সুখদুঃখ-বিরহমিলন পূর্ণ ভালোবাসা প্রবল, না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল। আমার বোধ হয় সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা আধ্যাত্মিক জাতীয়, উদাসীন গৃহত্যাগী; নিরাকারের অভিমুখী। আর ভালোবাসাটা লৌকিক জাতীয় সাকারে জড়িত।... যে ভালোবাসে সে অভাবদুঃখপীড়িত অসম্পূর্ণ মানুষকে ভালোবাসে, সুতরাং অগাধ ক্ষমা সহিষ্ণুতা প্রেমের আবশ্যক-আর যে সৌন্দর্যব্যাকুল, সে পরিপূর্ণতার প্রয়াসী, তার অনন্ত তৃষ্ণা। মানুষের মধ্যে দুই অংশই আছে, অপূর্ণ এবং পূর্ণ- যে যেটা অধিক করে অনুভব করে।..."[২২]

১২৯০ সালে ২৪ শে অগ্রহায়ণ মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে কবিগুরুর বিবাহ সম্পন্ন হয়। কুলপঞ্জী অনুসারে তাঁর নাম ছিল ভবতারিণী। ঠাকুরবাড়িতে নতুন বধূর এই পুরোনো নাম ছিল একেবারে অচল, তাই নতুন নামকরণ করা হয় মৃণালিনী। নববধূকে তিনি অত্যন্ত স্নেহের সাথে গ্রহণ করেন। কবির মৃত্যুর পর প্রকাশিত চিঠিপত্রে আমরা দেখতে পাই সংসার বিষয়ে কবি যেমন ছিলেন স্নেহশীল তেমনি ছিলেন কর্তব্যপরায়ণ। বিবাহের বছরখানের পর প্রিয় বৌঠান কাদম্বরী দেবী মৃত্যুবরণ করেন। সেই সময় তাঁদের পরিবারের ওপর দিয়ে প্রবল মৃত্যুঝড় প্রবাহিত হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে পরিবারের অনেক প্রিয়জন হারিয়েছেন। মৃত্যুশোক সম্পর্কে কবির অনুভবটি যেন এমন-

"কাদম্বরী দেবী আত্মহত্যা করলে রবীন্দ্রনাথ তীব্র শোকের যন্ত্রণা অনুভব করেন। প্রিয়জনের মৃত্যু দুঃখের এই কথাটিই তাঁর কাছে বড়ো হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যু, মেয়ের মৃত্যু, পিতার মৃত্যু তাঁকে অন্য একটি অনুভবের সামনে দাঁড় করালো, মৃত্যু যদি এতোটা তীব্র ভয়ঙ্কর হয়ে দেখা দেয়, তাহলে জীবনের মানে গিয়ে কোথায় দাঁড়ায়। স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুশোকে তিনি সান্ত্বনা পেলেন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে এবং কার্যত এই সান্ত্বনা- সিদ্ধান্তই জীবনে অনেক শোকের আঘাত সয়ে তাঁকে অর্থপূর্ণভাবে বেঁচে থাকবার এবং কাজ করে যাবার প্রেরণা যোগালো। সে সময়ে রচিত গানে তিনি সেই সান্ত্বনা খুঁজে পাবার কথাটি জানালেন। গানটি হচ্ছে-

আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু বিরহদহন লাগে।
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে ॥
তবু প্রাণ নিত্যধারা, হাসে সূর্য চন্দ্র তারা,
বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে॥ ..."[২৩]

প্রত্যেক মৃত্যুশোক তাঁর লেখনীতে নতুন বেদনার সঞ্চার করলেও কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুশোক কবিকে তাঁর পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদ শোকের সঙ্গে মিলিত হয়ে অশ্রুমালা দীর্ঘ করে গেঁথে চলেছিল। এই শোকই এই বিরহ তাঁর সমস্ত প্রেমসঙ্গীতের মন্দিরে একমাত্র বেদী।

রবীন্দ্রনাথের প্রেম বিষয়ক কবিতার মধ্যে দুই ধারাই এসে মেশে- উপলব্ধি ও প্রসাধন, আবেগ ও ভঙ্গি, অভিজ্ঞতা ও শিল্প। প্রেমের কবিতা ও প্রেমের গান এই উভয় জাতীয় সৃষ্টি বিষয়ে দুই পৃথক মানদণ্ড ব্যবহার্য নয়। মহুয়া কাব্যরচনা প্রসঙ্গে কবি তাঁর প্রেমের কবিতাগুলোর যে বিশ্লেষণ করেছিলেন, তাঁর প্রেমের গানের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হতে পারে। কবি লিখেছেন-

"প্রেমের মধ্যে সৃষ্টিশক্তির ক্রিয়া প্রবল। প্রেম সাধারণ মানুষকে অসাধারণ করে রচনা করে- নিজের ভিতরকার বর্ণে রসে রূপে। তার সাথে যোগ দেয় বাইরের প্রকৃতি থেকে নানা গান গন্ধ, নানা আভাস। এমনি করে অন্তরে-বাহিরে মিলনে চিত্তের নিভৃত লোকে প্রেমের অপরূপ প্রসাধন নির্মিত হতে থাকে- সেখানে ভাবে ভঙ্গিতে সাজে সজ্জায় নূতন নূতন প্রকাশের জন্য ব্যাকুলতা, সেখানে অনির্বচনীয়ের নানা ছন্দ, নানা ব্যঞ্জনা। একদিকে এই প্রসাধনের বৈচিত্র্য, আর একদিকে এই উপলব্ধির নিবিড়তা ও বিশেষত্ব।"[২৪]

রবীন্দ্রনাথের প্রেমভাবনায় তাঁর গানে বেদনার রূপটি বিশেষভাবে প্রতীয়মান বিরহই প্রেম। বিরহ প্রেমের একটি ঘনীভূত রূপ। রবীন্দ্রনাথ রচিত পূজাপর্যায়ের একটি গানে বিরহের প্রকাশ এমন-

হেরি অহরহ তোমারি বিরহ ভুবনে ভুবনে রাজে হে,...
... ঘরে ঘরে আজি কত বেদনায় তোমারি গভীর বিরহ ঘনায়
কত প্রেমে হায়, কত বাসনায়, কত সুখে দুখে কাজে হে!
সকল জীবন উদাস করিয়া কত গানে সুরে গলিয়া ঝরিয়া
তোমার বিরহ উঠিছে ভরিয়া আমার হিয়ার মাঝে হে ॥

পূজাপর্যায়ের গান বলে আমরা ঈশ্বর প্রেমের অনুভূতি তা বুঝতে পারি। কিন্তু এই যে বিশ্বব্যাপ্ত বিরহ তা যেন কবির ব্যক্তি হৃদয়ে অপ্রাপ্তি বেদনার অশ্রুধারা প্রতীক্ষায় ব্যাকুল, তার সাথেও মিলে যায় ঈশ্বর প্রেম অর্থাৎ পূজা প্রেমে রূপান্তরিত হয়ে জীবনদেবতায় রূপ নেয়। এ যেন প্রথম জীবনের প্রত্যক্ষ প্রেমানুভূতির যে বিরহ বেদনার দুঃসহ বিচ্ছেদ, বিরহীর রাগিনী শোনা যায় তারই পরবর্তীরূপ প্রকাশ পায় গানটিতে। জীবনদেবতার এই রূপ কবির পূজাপর্যায়ের আরও অনেক গানে প্রকাশ পায়। যেমন : পূজা ও প্রার্থনা পর্যায়ের একটি গানের উদাহরণ-

তোমায় যতনে রাখিব হে, রাখিব কাছে-
প্রেমকুসুমের মধুসৌরভে, নাথ, তোমারে ভুলাব হে ॥
তোমার প্রেমে, সখা, সাজিব সুন্দর-
হৃদয়হারী, তোমারি পথ রহিব চেয়ে ॥
আপনি আসিবে, কেমনে ছাড়িবে আর-
মধুর হাসি বিকাশি রবে হৃদয়াকাশে ॥

এই গানটির কথাগুলো পড়লে মনে হবে প্রেমপর্যায়ের গান। প্রত্যেকটি শব্দ যেন প্রেমিকের ভাষা- "এখানে 'নাথ' শব্দটি একালে অপ্রচলিত হলেও গানটির রচনাকালে (১৮৮৫) তা প্রেমিকের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হত। এমন কি বিশ শতকের (১৯৩৬) 'শ্যামা- ও বলেছে হে ক্ষমা করো নাথ।"[২৫]

রবীন্দ্রনাথের প্রেমভাবনায় নিসর্গ প্রেমের অনুভূতি পাওয়া যায়, যা আমরা পূর্বে 'সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে' গানটির উদাহরণ দিয়েছি। যেখানে কবি প্রেমিককে নিসর্গের সাথে তুলনা করেছেন। প্রকৃতির পটভূমিকায় প্রেমের অনুভূতিকে প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গানে 'পূজা' ও 'প্রেম' এর মধ্যে পার্থক্য পাওয়া যায় না। তিনি ঈশ্বর ও মানব উভয়কে সমপর্যায়ে স্থান দিয়েছেন। যেমন : প্রেমপর্যায়ের একটি গান-

আহা, তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা, প্রিয় আমার, ওগো প্রিয়...
... তুমি সাধ ক'রে নাথ, ধরা দিয়ে আমারও রঙ বক্ষে নিয়ো-
এই হৃৎকমলের রাঙা রেনু রাঙাবে ওই উত্তরীয় ॥

আমরা জানি, অতীতের প্রেম বর্তমানেও পথ চিনে আসে। রূপ বদলায় কিন্তু প্রেম বদলায় না। রবীন্দ্রনাথের প্রেম ভাবনায় এরই প্রতিফলন দেখতে পাই। প্রথম জীবনে শুরুর দিকে কবির যে প্রেমের উপলব্ধি, পরিণত বয়সে তার রূপটির পরিবর্তন পাই। কৈশোর বয়সে প্রেমের যে গভীর অনুভূতি ও ভাবনা তা রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানের পরিণত রূপকে শ্রোতার কাছে পূজাপর্যায়ে উত্তীর্ণ করেছেন। মানবপ্রেম, নিসর্গপ্রেম দ্রবীভূত হয়ে পূজায় পরিণত হয়েছে। তাইতো 'প্রেম' না 'পূজা' তা গানে ধরা যায় না, কোন পর্যায়ের গান। পরিণত কবির প্রেম জীবনদেবতায় রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে। তাইতো কবি বাউল সুরে পূজাপর্যায়ের গানে বলেছেন-

আমি কান পেতে রই ও আমার আপন হৃদয়গহন-দ্বারে বারে বারে
কোন্ গোপনবাসীর কান্নাহাসির গোপন কথা শুনিবারে- বারে বারে ॥ ...
... মাঝে মাঝে তার বারতা আমার ভাষায় পায় কি কথা রে
ওসে আমায় জানি পাঠায় বাণী গানের তানে লুকিয়ে তারে বারে বারে ॥

কিংবা পূজাপর্যায়ের আরেকটি গান-

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে দেখতে আমি পাইনি
তোমায় দেখতে আমি পাইনি
বাহির-পানে চোখ মেলেছি আমার হৃদয়-পানে চাই নি ॥ ....
... গোপন রহি গভীর প্রাণে আমার দুঃখসুখের গানে
সুর দিয়েছ তুমি, আমি তোমার গান তো গাই নি ॥

পূজাপর্যায়ের এই গান দুটি স্বভাবতই মনে হয় প্রেমের গান, প্রথম দিকের প্রেমভাবনায় কবি পাওয়া না পাওয়ার ঊর্ধ্বে ছিলেন। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে অনুভূতিগুলো পরিণত রূপ পেয়েছে। কবিগুরু বাউল দর্শন দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। বাউলরা জীবনকে একটা পথ হিসেবে মনে করেন। কবিগুরু প্রেমকেও তেমনি একটি পথ রূপে দেখেছেন। আমি শুরুতেই বলেছিলাম রবীন্দ্রনাথের প্রেমচেতনা ও বিরহ-অনুভূতি তার জীবনদর্শনের ভিন্ন এক শাব্দিক প্রকাশ। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন সম্পর্কে বলতে পারি, তিনি ছিলেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী। তিনি তাঁর সাহিত্য ও সঙ্গীত সাধানায় মানবমুক্তির মঙ্গলময় বাণীর জয়গান করেছেন। তিনি জীবনবোধে, রাজনৈতিক, সামাজিক, কৃষি, শিক্ষা সকল বিষয়ে উন্নয়ন ও সংস্কারের কথা বলেছেন। মানুষের মঙ্গল আর কল্যাণকেই তিনি তাঁর কর্ম ও সৃষ্টির ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। ফলে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো সঙ্গীতে তিনি উচ্চারণ করেছেন মানব মনের একান্ত অনুভূতি। *সঙ্গীতচিন্তায়* 'সঙ্গীত ও ভাব' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে বলেছেন-

"সঙ্গীতে এতখানি প্রাণ থাকা চাই, যাহাতে সে সমাজের বয়সের সহিত বাড়িতে থাকে, সমাজের পরিবর্তনের সহিত পরিবর্তিত হইতে থাকে, সমাজের উপর নিজের প্রভাব বিস্তৃত করিতে পারে ও তাহার উপরে সমাজের প্রভাব প্রযুক্ত হয়।"[২৬]

সুতরাং সঙ্গীতকে শুধু তিনি ভাবের বাহন মনে করেননি, সংগীতের যে সামাজিক ভূমিকা আছে, তাও তিনি স্বীকার করেছেন। ফলে রবীন্দ্রনাথকে বাঙালিরা তাদের উৎসবে, সংকটে, মুক্তিতে, প্রেরণায় সকল অনুভূতিতে কাছে পায়। দুর্বলের সহায়, একাকিত্বের সম্বল, ভীরুকে নির্ভীক হতে সাহস যোগায়। রবীন্দ্রনাথের রচিত নাটকগুলোতে যেমন তিনি সংলাপে গানের সংযোগে প্রেমের অনুভূতি প্রকাশ করেছেন তেমনি বিভিন্ন নাটকে দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার, ধনবাদী সমাজব্যবস্থার অভ্যন্তরে সঙ্কটে মিথ্যের আবরণ ইত্যাদি সমাজের বর্তমান পরিস্থিতিকে তুলে ধরেছিলেন। যেমন : *বিসর্জন*, *মুক্তধারা*, *রাজা*, *রক্তকরবী* ইত্যাদি নাটকের কথা উল্লেখযোগ্য। তিনি শিক্ষাকে দেখেছিলেন প্রযুক্তি হিসাবে। শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিত্তে মনুষ্যত্ববোধ ও বিশ্বাত্মচেতনা জাগ্রত করাই রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শনের মূল কথা। রবীন্দ্রনাথ পরিবেশ সচেতন দর্শনিকও ছিলেন। পরিবেশ রক্ষার জন্য তিনি গানও রচনা করেছেন। বর্ষায় ঘটা করে শান্তিনিকেতনের চারিপাশে গাছ লাগাতেন। সুতরাং বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধে আমরা মানবতাধর্মিতা ছাড়াও পাই শান্তির পক্ষে অতুলনীয় এক শক্তি। বর্তমান সময়ে মানুষে মানুষে যে হানাহানি, যে চরম বিচ্ছিন্নতা রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে হয়ে উঠতে পারেন উত্তরণের এক মহাশক্তি।

প্রথম অধ্যায়ের জীবনবোধ ও প্রেমভাবনায় যে আলোচনা আমরা করেছি তা থেকে একটি কথা স্পষ্ট, রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক পরিবেশ, পারিবারিক আভিজাত্য শৈশবকালেই রবীন্দ্রনাথকে তার চারপাশকে গভীরভাবে অনুভব করতে শিখিয়েছিল। তাই তাঁর সারাজীবনের কাব্যসাধনায় কর্মময় জীবনের সকল অনুভূতি

তাঁর সৃষ্টির অন্যতম শক্তি। প্রেমভাবনায় সৌন্দর্যবোধে আদর্শ-সৌন্দর্য হচ্ছে দৈহিক, মানসিক ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সমন্বয়, সেই সংশ্লিষ্ট সৌন্দর্য রবীন্দ্রনাথের নিকট একটি রমণী মূর্তিতে উদ্ভাসিত। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, জীবনের মধ্যে অন্তরকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালোবাসা, আর প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করা হল সৌন্দর্যসম্ভোগ। বৈষ্ণব ধর্মে যেমন পৃথিবীর সমস্ত প্রেম-সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করার চেষ্টা করা হয়। তেমনি রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের প্রেমভাবনায় 'প্রেম' জীবনদেবতায় রূপ নিয়েছে।

রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেম ও বিরহবোধের মধ্য দিয়েই বস্তুত তাঁর জীবনচেতনা ও প্রেমভাবনার সার্থক প্রকাশ ঘটেছে।

তথ্যসূত্র

০১. প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী ১ম খণ্ড*, প্রকাশনা : আনন্দ পাবলিশার্স, প্রকাশকাল : জ্যৈষ্ঠ ১৪২০, পৃ. ৪

০২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

০৩. ড. প্রিয়ব্রত চৌধুরী, *রবীন্দ্রসংগীত*, প্রকাশনা : দি জেনারেল বুকস, কোলকাতা বইমেলা, প্রকাশকাল : ২০০১, পৃ. ৬২

০৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

০৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

০৬. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড*, প্রকাশনা : বিশ্বভারতী, প্রকাশকাল : বৈশাখ ১৪২৪, পৃ. ১৭

০৭. অমিয় চক্রবর্তী, *রবীন্দ্রসংগীত পরিক্রমা*, প্রকাশনা : করুণা প্রিন্টার্স, প্রকাশকাল : ১৪০৮, পৃ. ৬

০৮. দেবদ্রত দত্ত, *সঙ্গীততত্ত্ব (রবীন্দ্র প্রসঙ্গ)*, প্রকাশনা : দেবব্রত দত্ত ট্রাস্ট, প্রকাশকাল : ২০০২, পৃ. ৮

০৯. অমিয় চক্রবর্তী, *রবীন্দ্রসংগীত পরিক্রমা*, প্রকাশনা : করুণা প্রিন্টার্স, প্রকাশকাল : ১৪০৮, পৃ. ৯

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি*, প্রকাশনা : বিশ্বভারতী, প্রকাশকাল : কার্তিক ১৪২৪, পৃ. ২৯

১১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড*, প্রকাশনা : বিশ্বভারতী, প্রকাশকাল : বৈশাখ ১৪২৪, পৃ. ২৫

১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি*, প্রকাশনা : বিশ্বভারতী, প্রকাশকাল : কার্তিক ১৪২৪, পৃ. ৫৪

১৩. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড*, প্রকাশনা : বিশ্বভারতী, প্রকাশকাল : বৈশাখ ১৪২৪, পৃ. ৪০

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

১৫. ড. অরুণকুমার বসু, *বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত*, প্রকাশনা : দে'জ পাবলিশিং, প্রকাশকাল : আগস্ট ১৯৯৪, পৃ. ৪৫৩

১৬. স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়, *সমকালের বাংলাগান ও রবীন্দ্রসংগীত*, প্রকাশনা : প্যাপিরাস, প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃ. ১৯

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

১৮. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড*, প্রকাশনা : বিশ্বভারতী, প্রকাশকাল : বৈশাখ ১৪২৪, পৃষ্ঠা: ৮৭, ৮৮

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

২০. ড. অরুণকুমার বসু, *বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত*, প্রকাশনা : দে'জ পাবলিশিং, প্রকাশকাল : শ্রাবণ ১৪০১, পৃ. ৪৫৬

২১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড*, প্রকাশনা : বিশ্বভারতী, প্রকাশকাল : বৈশাখ ১৪২৪, পৃ. ১১৫

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬, ১৭৭

২৩. করুণাময় গোস্বামী, *রবীন্দ্রসংগীতকলা ১ম খণ্ড*, প্রকাশনা : বাংলা একাডেমী, প্রকাশকাল : জুন ২০১৩, পৃ. ১৯

২৪. ড. অরুণকুমার বসু, *বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত*, প্রকাশনা : দে'জ পাবলিশিং, প্রকাশকাল : আগষ্ট ১৯৯৪, পৃ. ৪৫৯

২৫. প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, *গীতবিতানের আরশীনগর*, প্রকাশনা : একুশ শতক, প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ১৬৮

২৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সংগীতচিন্তা*, প্রকাশনা : বিশ্বভারতী, প্রকাশকাল : জৈষ্ঠ্য ১৪১১, পৃ. ০৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রেমচেতনা

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনব্যাপী লব্ধ অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও প্রখর অন্তর্দৃষ্টি শক্তিকে পুঁজি করে কাব্যরচনা করেছেন। কবির প্রেমচেতনা, তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে অর্জিত অনুভূতিগুলির শৈল্পিক বহিঃপ্রকাশ। তিনি ভাব ও অনুভাবের গভীরে গিয়ে জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন। ফলে কবির প্রেমচেতনায় আমাদের মনের কোনো অনুভূতিই তিনি প্রকাশ করতে বাদ রাখেননি। তাঁর কবি-প্রতিভার অন্যতম বৈশিষ্ট্য 'রোমান্টিকতা'। এই রোমান্টিক মানসপ্রবণতা কবির গানে, কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে নানান বৈচিত্র্যে রূপলাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের গানে প্রেমচেতনা বা প্রেমের অনুভূতি, প্রেমিকচিত্তের 'মিলন ও বিরহে'র বাণীর মধ্যদিয়ে প্রকাশ ঘটেছে। যেখানে প্রেম মানব, ঈশ্বর, প্রকৃতি এই ত্রিধারার মিলনে নবরূপে 'জীবনদেবতায়' রূপান্তরিত হয়েছে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রেমচেতনা নিরূপণে এই অধ্যায়কে তিনটি পরিচ্ছেদে বিভাজিত করা হয়েছে। কবির পারিবারিক আভিজাত্য, বাড়ির পরিবেশ, অগ্রজদের সান্নিধ্য, সেই সময়ের প্রেক্ষাপট এবং তৎকালীন ও পূর্ববর্তী গুণীজনদের প্রভাবদ্বারা প্রভাবিত ছিল তাঁর প্রেমচেতনার প্রাথমিক পর্ব। প্রেমের গানের যে বহুমাত্রিকতা, তা তাঁর প্রথম জীবনের কাব্যরচনার অভিজ্ঞতা দ্বারা আহরিত জ্ঞান ও উপলব্ধিরই বহিঃপ্রকাশ। যেমন–

"প্রথম দিকের কবিতায়, প্রাক্-*মানসী* পর্বের কাব্যে, রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক-চেতনায় জীবনের উচ্ছ্বাস আর আনন্দ আর বেদনার কথা উচ্চারণ করেছেন। রোমান্টিক অনুভববেদ্যতাই ছিল সে সব উচ্চারণের মূল প্রেরণা।... প্রাক্-*মানসী* পর্বে রবীন্দ্রনাথ বেদনার গীতোচ্ছ্বাস আর অন্তহীন যন্ত্রণার কথা উচ্চারণ করেছেন; এ পর্বে তাঁর জীবনচেতনার প্রধান বৈশিষ্ট্য রোমান্টিক অনুভববেদ্যতা। *মানসী* কাব্যে এসে রবীন্দ্রনাথের জীবনচেতনা নতুন পথে পরিচালিত হলো, রবীন্দ্র- প্রতিভায় ঘটল বিরাট বাঁক-পরিবর্তন।... এ কাব্যেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম প্রাচীন ভারতীয় জীবন থেকে উৎস সংগ্রহ করে আধুনিক জীবনের বহুমাত্রিক চেতনার ঐক্য সাধন করেছেন– অতীতের সঙ্গে নির্মাণ করেছেন বর্তমানের সেতুবন্ধ। *সোনার তরী-চিত্রা* পর্বে রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধে ঘটল ব্যাপক পরিবর্তন। এ পর্বে রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিকতার মোহন জগৎ ছেড়ে ফিরে এলেন বাস্তবের কঠিন মৃত্তিকায়।"[১]

প্রথম পরিচ্ছেদে *রবীন্দ্রসংঙ্গীতে প্রেমচেতনার সূচনালগ্ন* শিরোনামে কবির জীবনের সূচনালগ্নে কাব্যরচনায় প্রেমভাবনার প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। কালানুক্রমিক সূচির প্রথম পর্বের গানগুলিতে প্রেমভাবনায় কবির এই সকল কাব্যের প্রভাব অনুধাবন করা যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে *রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রেম : মিলন ও বিরহ* শিরোনামে *গীতবিতানের* প্রেমপর্যায়ের গানের ভাবানুসারে সাজানো *প্রেম* ও *প্রেমবৈচিত্র্য* উপবিভাগের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। প্রেমপর্যায়ের গানগুলিকে কালানুক্রমিক তালিকা করে তিনটি পর্বে ভাগ করে, গানগুলিতে কীভাবে কবির প্রেমের 'মিলন ও বিরহ' রূপলাভ করেছে তা অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে। কবির জীবনে প্রেম ও বিরহবোধের মধ্য দিয়ে যে প্রকাশ তা তাঁর জীবনচেতনারই বহিঃপ্রকাশ। তাঁর প্রেমবোধে পাওয়া যায় বহুমাত্রিকতা। যেমন–

"..রবীন্দ্রনাথের প্রেমচেতনা দ্বিমাত্রিক। কখনো প্রেম তাঁর কাছে ধরা দিয়েছে প্রাত্যহিক পরিচয়ে, কখনো- বা চিরন্তনতার ব্যঞ্জনায়। কখনো তাঁর চেতনায় প্রেম এসেছে ঘরের বধূ হয়ে কখনো- বা শাশ্বত অধরা প্রেমিকা রূপে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, উপন্যাস এবং সঙ্গীতে আমরা বহুমাত্রিক প্রেমবোধের পরিচয় পাই...।"[২]

১৮৯০ এর দশকে রবীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গে আগমনের মধ্যদিয়ে তাঁর জীবন অভিজ্ঞতার যে পরিবর্তন আসে, তাঁর প্রভাব *গীতাঞ্জলি–গীতালি–গীতিমাল্য*–পর্বের গানগুলিতে পাই। *সোনারতরী* পর্বের বাস্তবজীবন থেকে তিনি এসময় ঈশ্বর সাধনায় নতুনভাবে সমর্পিত হলেন। যেখানে ঈশ্বরে কাছে নিজেকে সমর্পন করাই কবির জীবনচেতনার মূলভাব। পরবর্তীতে *বলাকা*, *পুনশ্চ* কাব্যে কবির জীবনবোধের যে পরিবর্তন ঘটে তা কবিকে দার্শনিক কবি হিসাবে পরিচিত করিয়ে দেয়। কাব্যের মধ্যে প্রকাশিত জীবনবোধ ও প্রেমচেতনা তা কবির গানের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রভাবিত ও প্রযোজ্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কবির প্রেমচেতনার শুধু সূচনালগ্নে রচিত কাব্যগুলি সম্পর্কেই আলোকপাত করেছি।

কবির গানে প্রেমচেতনায় যে সকল নারীদের প্রভাবের কথা উল্লেখ আছে তাঁদেরকে আমরা পাই তাঁর জীবনে মানসসঙ্গী হিসাবে। কারণ–

"...রবীন্দ্রনাথের নারী মূলত শাশ্বত নারীর প্রতীকী রূপ, রবীন্দ্রসঙ্গীতে নারী কখনো হয়ে উঠে তাঁর কাব্যলক্ষ্মী, কখনো জীবনদেবতা, কখনো- বা লীলাসঙ্গিনী, স্বপ্ন-সহচরী। রবীন্দ্রনাথের সংগীতভুবনের নারী কোনো মর্ত্যের মানবী নয়, বরং সে–নারী রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক জীবনতত্ত্ব ও লীলারহস্যের অন্তর সঙ্গিনী, কবি-মানসী। রবীন্দ্রসঙ্গীতের নারী 'বিশ্বের কবিতা'-'গৃহের বনিতা' নয়। রবীন্দ্রনাথের উচ্চারণেই আছে এই শাশ্বত নারীর প্রতি তাঁর আত্ম-নিবেদনের আহবান :

আমারে যে ডাক দিবে এ জীবনে তারে বারেবার ফিরেছি ডাকিয়া,
সে নারী বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে খুলিয়াছে দ্বার থাকিয়া থাকিয়া।"[৩]

প্রেমের গানে 'মিলন ও বিরহে' কালানুক্রমিক সূচির প্রথমপর্বে নারীর প্রভাব প্রত্যক্ষ রূপে কিছু উৎসর্গকৃত গান রূপে পাওয়া যায়। পরবর্তী পর্বগুলিতে নারী তাঁর শুধু ভালোবাসার বা ভালোলাগার সঙ্গিনী হিসাবে গানে প্রকাশিত নয়। প্রেমের নারী, গানে পূজার দেবীতে রূপান্তরিত হয়। এই কাল্পনিক নারী, যাকে আমরা বলি কবির মানসসঙ্গিনী কিংবা লীলাসঙ্গিনী, কবিকে তারা তাঁর আশি বছরের আবর্তে চালিয়ে নিয়ে গেছেন, যুগ-যুগান্তরের সীমা পেরিয়ে অসীমের পথে। কবির মানসপটে পূজা ও প্রেম পরস্পর মিলিত হয়ে জীবনদেবতার রূপ নিয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে *'রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রেম ও পূজা'* শিরোনামে অধ্যায়টিতে কবির চিত্তে পূজা পর্যায়ের গানে কিভাবে ঈশ্বরভাবনা রূপলাভ করেছে তাঁর আলোকপাত করা হয়েছে। পূজা ও প্রেম কবির গানে যেই উপলব্ধিতে এসে পরস্পর একত্রিত হয়ে জীবনদেবতার রূপ নিয়েছে তা আলোচনা করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. বিশ্বজিৎ ঘোষ, *অশেষ রবীন্দ্রনাথ*, প্রকাশনা : অন্যপ্রকাশ, প্রকাশকাল : একুশে বইমেলা ২০২০, পৃ. ২১৭-২১৮

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০

প্রথম পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রেমচেতনার সূচনালগ্ন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রায় দুই হাজার দুইশত বত্রিশ (২,২৩২) সংখ্যক গান রচনা করেছেন। *গীতবিতানে* এই গানগুলিকে তিনি ছয়টি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। যেমন-

১. পূজা

২. স্বদেশ

৩. প্রেম

৪. প্রকৃতি

৫. বিচিত্র ও

৬. আনুষ্ঠানিক

এই ছয়টি পর্যায় ছাড়াও *গীতবিতানের* শেষে-নৃত্যনাট্য, গীতিনাট্য, নাট্যগীতি, জাতীয় সঙ্গীত, পূজা ও প্রার্থনা, আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত, প্রেম ও প্রকৃতি, ও সর্বশেষ পরিশিষ্ট নামে বিভাজন আছে। রবীন্দ্রনাথের তেরো থেকে আঠারো বছর বয়সের সময়কালে রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে *কবিকাহিনী*(১৮৭৮,নভেম্বর), *বনফুল* (১৮৮০, মার্চ), *ভানুসিংহের পদাবলী* (১৮৮৪), *শৈশবসংগীত*(১৮৮৪, মে) এবং *রুদ্রচণ্ড*(১৮৮১) উল্লেখযোগ্য। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন '*বনফুল*' সমগ্র কাব্যরূপে সাময়িক পত্রে আগে প্রকাশিত হলেও, '*কবিকাহিনী*'ই পুস্তক আকারে প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম রচনা। গ্রন্থগুলোতে পাত্র-পাত্রীর প্রণয় আবেগ, অব্যক্ত প্রেমবেদনা পাওয়া না পাওয়ার আক্ষেপ ইত্যাদি ভালোবাসার আবেগের বহিঃপ্রকাশ কাহিনীর বর্ণনার পাশাপাশি তাদের কণ্ঠের ক্ষুদ্র গানগুলির মাধ্যমে কবির কিশোর বয়সের রোমান্টিক ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে।

১৮৭৮ সালে বিলেত যাত্রার পূর্বে তাঁহার মানসিক অবস্থার যে অস্থির চঞ্চলতা বিরাজ করছিল তার চিত্র পাওয়া যায় '*কবিকাহিনী*'র রচনায়। কারণ বিলেত যাত্রা কবির জীবনে এক নূতন পর্বের সূচনা ছিল। পনেরো ষোল বৎসর বয়সে কবি কাহিনীর ঘটনা এমন-

"কবি কাহিনীর নায়ক কবি শূন্য হৃদয়ে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ান। একদিন অপরাহ্নে শ্রান্ত হৃদয়ে এক বৃক্ষতলে শুইয়া আছেন, এমন সময়ে একটি বালিকা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। বালিকার নিকট কবি আপনার হৃদয়ের কত কথা বলে গেলেন, এতদিন পরে তাঁহার মনে হইল হৃদয় যেন একটু জুড়াইল। বালিকার নাম নলিনী, রবীন্দ্রনাথের এক অতি প্রিয়নাম। নলিনীর সঙ্গে কবি কুটীরে চলে গেলেন; ক্রমে উভয় উভয়ের ভালোবাসায় আকৃষ্ট হইলেন। কিন্তু এত সুখেও কবির মন তৃপ্ত হলো না। বালিকা তাহার অন্তরের সমস্ত ভালোবাসা দিয়াও কবির মন পাইল না। মনের ভিতরে অশান্তি যখন কিছুতেই মিটিল না তখন কবি দেশভ্রমণে বাহির হইলেন। কবি বলেছেন- 'নলিনী! চলিনু আমি ভ্রমিতে পৃথিবী'। কিন্তু কোথাও গিয়ে কবি শান্তি পেলেন না। কিন্তু নলিনীর কথা সর্বদাই মনে জাগে, শান্তি খুঁজিয়া খুঁজিয়া কোথাও শান্তি পাইলেন না। বহুকাল পরে কবি যখন নলিনীর কাছে ফিরে আসিলেন সে তখন চিরনিদ্রায় মগ্ন।"[১]

উল্লিখিত কাহিনী থেকে বোঝা যায় নলিনীর কাছে উপস্থিত থাকা অবস্থায় তিনি তার ভালোবাসার মূল্যায়ন করেন নাই। কিন্তু দূরে গিয়ে প্রেমের যে তাড়না তিনি অনুভব করেন তা বিফল হয় ফিরে এসে। পরিণত বয়সে *'জীবনস্মৃতি'তে কবিকাহিনী* প্রসঙ্গে কবি বলেছেন-

"যে-বয়সে লেখক জগতের আর-সমস্তকে তেমন করিয়া দেখে নাই, কেবল নিজের অপরিস্ফুটতার ছায়ামূর্তিটাকেই খুব বড়ো করিয়া দেখিতেছে, ইহা সেই বয়সের লেখা। সেইজন্য ইহার নায়ক কবি। সে কবি যে লেখকের সত্তা তাহা নহে- লেখক আপনাকে যাহা বলিয়া মনে করিতে ও ঘোষণা করিতে ইচ্ছা করে, ইহা তাহাই। ঠিক ইচ্ছা করে বলিলে যাহা বুঝায় তাহাও নহে- যাহা ইচ্ছা করা উচিত, অর্থাৎ যেরুপটি হইলে অন্য দশজনে মাথা নাড়িয়া বলিবে হ্যাঁ কবি বটে, ইহা সেই জিনিসটি। ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের ঘটা খুব আছে তরুণ কবির পক্ষে এইটি বড়ো উপাদেয়, কারণ ইহা শুনিতে খুব বড়ো এবং বলিতে খুব সহজ।"[২]

*'কবিকাহিনী'*তে বালক রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রেমবোধের আদর্শ ফুটে ওঠে। এই আদর্শ খুব গভীর না হলেও তা বয়স বিবেচনায় বিশেষ মর্যাদার। কবি বলেছেন-

... যে দিন আসিবে গিরি, এখনিই যেন
দূর ভবিষ্যৎ সেই পেতেছি দেখিতে
যেই দিন এ প্রেমে হইয়া নিবদ্ধ
মিলিবেক কোটি কোটি মানবহৃদয়।

এখানে, মনের অজান্তেই তাঁর এই আদর্শ হয়ত বালক কবির পরবর্তী জীবনের জীবনবোধে প্রতিফলিত হয়েছে। কবির চৌদ্দ বৎসর সাত মাস বয়সে *জ্ঞানাঙ্কুরে* 'বনফুল' প্রকাশিত হয়। কাব্যরচনাটি লেখার তিন চার বছর পর দাদা সৌমেন্দ্রনাথ ভ্রাতার প্রতি অপার স্নেহের উৎসাহে তা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করেন। 'বনফুল' আখ্যায়িকা কাব্য। আমাদের বাংলা সাহিত্যের রোমান্টিক আখ্যায়িকা কাব্য ও গাথা কবিতার অন্যতম প্রবর্তক ছিলেন অক্ষয় চৌধুরী। সেই যুগে বহু কবির কাব্য প্রেরণার উৎস ছিল সে সময়ের সাময়িক কবি ও ইংরেজি কাব্য ও আদর্শ কে কেন্দ্র করে। *'বনফুল'* সেই আদর্শের রচিত। কাব্যে নায়ক নায়িকাদের প্রেমকাহিনীর পটভূমি পাশ্চাত্য সমাজ। যেমন *'বনফুল'* কাব্যে কমলার কণ্ঠে শোনা যায়-

লভেছি জনম করিতে রোদন
রোদন করিব জীবন ভরে।

কমলার বিরহের প্রকাশ তার জন্মই ব্যথা সহ্য করবার এবং ভালোবাসার জন্যই এই ব্যথা সে জীবনভর সইতে রাজি। কারণ সংসারে অপরিপক্ক বিবাহিত কমলা ভালোবেসেছিল স্বামীর বন্ধু নীরদকে। জগৎ সংসারে এই প্রেম তো মেনে নেবার নয়। এই নিষিদ্ধ প্রেমের গভীর অনুভূতি প্রকাশ করেছে কমলা বর্ণিত লাইনে। আবার, *'কবিকাহিনী'* গ্রন্থে নায়ক 'কবি' এবং নলিনী হল তার 'প্রেমপাত্রী'। সেখানে কবি বলেছেন-

এখনও বুকের মাঝে রয়েছে দারুন শূন্য
সে শূন্য কি এ জনমে পুরিবে না আর
মনের মন্দিরে- মাঝে প্রতিমা নাহিক যেন
শুধু এ আঁধার গৃহ রয়েছে পড়িয়া।

প্রকৃতিলালিত সৌন্দর্যমুগ্ধ কবি এক মানবীপ্রেমের অনির্দেশ্য অভাবে বিহ্বলে উন্মন এমন সময় পরিচয় ঘটে নলিনীর সঙ্গে। তবু, কবি ও নলিনীর প্রণয়নিবেদন বিঘ্নহীন অনায়াস হয়নি। হৃদয়ের অবারিত বেদনায় কবি বিশ্বভ্রমণে বের হয়েছেন, কিন্তু তার থেকেও বেশি অশান্তিতে অন্তরে নলিনীর স্মৃতি বহন করে- মুমূর্ষু নলিনীর কাছে ফিরে এসেছেন। ১২৮২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে *জ্ঞানাঙ্কুর* ও *প্রতিবিম্বে* বালক কবির *বনফুল* প্রকাশিত হতে থাকে এবং ভারতীতে ১২৮৪ সালের 'পৌষ' হতে 'চৈত্রে'র মধ্যে কিশোর কবির *কবিকাহিনী* প্রকাশিত হয়। কাব্য দু'টির প্রকাশের ব্যবধান দুই বৎসর। সুতরাং চৌদ্দ থেকে ষোল বৎসরের মধ্যে কবি যা রচনা করেছেন তা অনুসন্ধানে দেখা যায়-

"এই দুই বৎসরের মধ্যে যে সকল কবিতা, গান ও কিছু কিছু গদ্যপ্রবন্ধাদি লিখিয়াছিলেন, তাহা মালতীপুঁথির ভগ্নস্তুপ হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। তবে এই পর্বে একটা স্বল্পকালের মধ্যে রচিত 'ভানুসিংহের কবিতা' লিখিতে দেখি। এই সময়ের বহু কবিতা রচিত হয়, সেগুলি শৈশব-সংগীত কাব্যে সংগৃহীত হয় অনেক কাল পরে (১২৯১ ॥ ১৮৮৪)।... 'বাল্যকালের রচনা' বলিয়া 'বিষ ও সুধা' নামে দীর্ঘ যে গাথা তা সান্ধ্যসঙ্গীত প্রথম সংস্করণের (১৮৮২) শেষাংশে সংযোজিত করেন যা মাতলীপুঁথির মধ্যেও রহিয়াছে।"[৩]

বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর লেখায় কতগুলি প্রিয় নাম ব্যবহার করতে দেখা যায়। যেমন- নলিনী, মালতী, ললিত, নীরদ, দামিনী, অমিয়া। 'নলিনী' ও 'দামিনী'র নামে অনেক কবিতা আছে। কবিতার পর, রবীন্দ্রনাথ কবিতায় গল্প লেখা শুরু করেন। যা 'গাথা' নাম দিয়ে *'শৈশব-সংগীতে'র* মধ্যে সংগৃহীত হয়। উল্লেখযোগ্য গাথার মধ্যে- *ফুলবালা*, *প্রতিশোধ*, *লীলা*, *অপ্সরা প্রেম*, *ভগ্নতরী* (বিলাত বাসকালে রচিত)। *ফুলবালা* গাথার একটি গান-

গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে, মধুপ, হোথা যাস নে-
ফুলের মধু লুটিতে গিয়ে কাঁটার ঘা খাস নে ॥
হেথায় বেলা, হোথায় চাঁপা, শেফালি হেথা ফুটিয়ে-
ওদের সাথে মনের ব্যথা বল্ রে মুখ ফুটিয়ে ॥
ভ্রমর কহে, 'হোথায় বেলা হোথায় আছে নলিনী-
ওদের কাছে বলিব নাকো আজিও যাহা বলি নি।

বাল্যকালে কবির লেখার শক্তি ছিল অসাধারণ। মনের অনুভূতিগুলোকে তিনি নাটকের সংলাপে, গানের কথা ও সুরে প্রকাশ করেছেন এবং অন্য কবিদের দ্বারা প্রভাবিতও হয়েছেন। ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন বলে ইউরোপীয় সাহিত্যিকদের রচিত প্রেমের কবিতা দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছেন সেই সময়। যেমন- দান্তে, পিত্রার্ক, প্রমুখ। দান্তের একটি সনেট তিনি অনুবাদ করেছিলেন-

"প্রেম-বন্দী হৃদি যাঁরা, সুকোমল মন, দেখে মনে হল যেন প্রফুল্ল আনন;
যাঁরা পড়িবেন এই সংগীত আমার, মোর হৃৎপিন্ড রহে করতলে তাঁর
তাঁরা মোর অনুনয় করুন শ্রবণ, বাহু'পরে শান্তভাবে করিয়া শয়ন
বুঝায়ে দিউন মোরে অর্থ কি ইহার? ঘুমাইয়া রয়েছেন মহিলা আমার..."[৪]

আবার পিত্রার্কের একটি কবিতার অনুবাদ-

"হা রে হতভাগ্য বিহঙ্গম সঙ্গীহীন!
সুখ-ঋতু অবসানে গাহিছিস গীত!
ফুরাইছে গ্রীষ্ম ঋতু ফুরাইছে দিন
আসিছে রজনী ঘোর আসিতেছে শীত!..."[৫]

দান্তে ও পিত্রার্ক তাঁদের আরাধ্য প্রেম সম্পদকে দূর থেকে দেখেছেন, কাব্যের মধ্যে প্রেমের অঞ্জলি নিবেদন করেছেন। তাসো, লিওনারার প্রেমে আত্মহারা হয়ে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কেবল যাতনা ও উৎপীড়নের ভাগি হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। মধ্যযুগীয় এইসব *কবিকাহিনী* তরুণ বাঙালি কবির মনে কি রস সঞ্চার করেছিল তার রহস্য ভেদ করা অসম্ভব হলেও তা ধারণা করা যায় যে তরুণ কবির প্রেমভাবনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। শুধু বিদেশী কবি নয় তিনি দেশীয় কবিদের দ্বারাও অনুপ্রাণিত হয়েছেন। বাল্যকালে 'বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের' রচনা তাঁর পছন্দের ছিল। সেখানে রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমের যে লীলা, তার দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হয়ে 'ভানুসিংহ' ছদ্মনামে অনেকগুলো পদ রচনা করেছেন। কবি ষোলো বৎসর বয়সে *ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী* রচনা করেন। এ সম্পর্কে কবি বলেছেন-

"একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলাদিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতর এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা স্লেট লইয়া লিখিলাম- 'গহন কুসুমকুঞ্জ-মাঝে'।"[৬]

কৈশোরে কবি কালিদাস ও বৈষ্ণবকবিদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তাঁরা পৌরাণিক কাল ও ঐতিহাসিক কালের মিলন ঘটিয়ে রচনায় যে রোমান্সের চিত্ররূপ ফুটিয়েছিলেন তা বালক কবির 'কল্পনায়' অনুপ্রেরণা যোগায়। তবে, কবির রচনায় 'রাধা' একমাত্র অধিবাসী, তাঁদের মতন 'শতেক যুগের কবি দলে মিলি আকাশে' শতকণ্ঠের ধ্বনি নাই। আছে কেবলি-

গহন কুসুমকুঞ্জ-মাঝে মৃদুল মধুর বংশি বাজে।
বিসরি ত্রাস লোকলাজে সজনি, আও আও লো ॥...
...আও আও সজনিবৃন্দ, হেরব সখি শ্রীগোবিন্দ-
শ্যামকো পদারবিন্দ ভানুসিংহ বন্দিছে ॥

*'ভারতী'*তে ভানুসিংহের প্রথম যে কবিতাটি বের হয় তা হল-

"সজনী গো- আঁধার রজনী ঘোর ঘনঘটা চমকত দামিনী রে।"[৭]

বৈষ্ণব কবিতার প্রতি কবির ভালোলাগা প্রসঙ্গে পত্রে লিখেছিলেন-

"আমার বয়স যখন তেরো-চৌদ্দ তখন থেকে আমি অত্যন্ত আনন্দ ও আগ্রহের সঙ্গে বৈষ্ণব-পদাবলী পাঠ করেছি, তার ছন্দ রস ভাষা ভাব সমস্তই আমাকে মুগ্ধ করত। যদিও বয়স অল্প ছিল তবু অস্পষ্ট অস্ফুট রকমেও বৈষ্ণবধর্মতত্ত্বের মধ্যে আমি প্রবেশ লাভ করেছিলাম।"[৮]

'ভানুসিংহ' পদাবলীতে কবির ছদ্ম নাম। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর কাছে ইংরেজ বালক কবি চ্যাটার্টনের বিবরণ কালে অনুপ্রাণিত হয়ে কবি 'ভানুসিংহ' ছদ্মনামে পদগুলি রচনা করেন। এই পদগুলির পূর্বে কবি যে সকল কবিতা বা কাব্য রচনা করেছেন তার সাথে *ভানুসিংহের পদাবলীর* প্রভেদ এই যে, পদাবলী পূর্ণাঙ্গ, সে নিজের গৌরবে দাঁড়াতে পারে। এ প্রসঙ্গে প্রমথনাথ বিশী বলেন-

"প্রভাতসঙ্গীত এবং ছবি ও গান কবির পরিণত কাব্যকে ঠেস দিয়া দণ্ডায়মান, পরবর্তীদের সাহায্য ছাড়া কোনো পাঠক তাহাদিগকে প্রসন্নমনে গ্রহণ করিবেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু ভানুসিংহের পক্ষে পরপ্রত্যাশা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, সে আপনাতে আপনি বিধৃত ও সম্পূর্ণ।"[৯]

ভানুসিংহের পদাবলীতে মোট বাইশটি পদ আছে। যা *গীতবিতানে* শেষের দিকে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ভানুসিংহ পদাবলীর ভাব প্রসঙ্গে দেবব্রতদত্ত বলেন-

"কবি তাঁর কাব্য সৃষ্টির ভিতর দিয়ে যে সত্যকে জেনেছিলেন, সেইটাকেই ধ্রুব সত্য বলে মেনেছিলেন তাঁর সমগ্র জীবনলীলায়। সৃষ্টির সঙ্গেই স্রষ্টার রয়েছে একটা অনাদি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। সীমা চায় অসীমের ভেতর আপনার সার্থকতা, অসীম চায় সীমার মধ্যে দিয়ে আত্মচেতনা ও আত্মানুভূতি- এখানেই রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণবতা। তাই তাঁর পদের ভাবগভীরতা প্রাচীন পদকর্তাদের রচনা থেকে কোন অংশে কম নয়। তাঁর রচিত পদাবলী কতকগুলি পদের সমষ্টি মাত্র, প্রত্যেকটি পদ স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং ভাষার সংযমে, ভাবের গভীরতায় ও ব্যঞ্জনায় মাধুর্যে ভাস্বর।"[১০]

কবি কাব্য রচনা করেন-তাঁর অন্তর্দৃষ্টি, অনুভূতি, আবেগ, কল্পনা এবং কবির বাস্তব জীবন থেকে আহরিত জ্ঞান দিয়ে। ঈশ্বরের সাথে ভক্তের মিলনের আকাঙ্ক্ষা হল অসীমের পথে-কবির বিচরণ। আবার ঈশ্বরের সৃষ্টির রূপ ও রস সীমার মধ্যে-কবির উপলব্ধির বিচরণ। তাই যেন মনে হয় যে, সীমার মাঝে অসীমের মিলন সাধন। কাব্য সৃষ্টির মধ্য দিয়েই এই মিলন সাধিত হয়। আর রবীন্দ্রনাথের ভাবনায়-

"পদাবলী শুধু কেবল সাহিত্য নয়, তার বয়সের বিশিষ্টতা বিশেষ ভাবের সীমানার দ্বারা বেষ্টিত। সীমানার মধ্যে আমার মন স্বাভাবিক স্বাধীনতার সঙ্গে বিচরণ করতে পারে না। তাই ভানুসিংহের সঙ্গে বৈষ্ণব চিত্তের অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা নেই।"[১১]

রবীন্দ্রনাথ পদাবলীকে শুধু সাহিত্য না বলে, নির্দিষ্ট বয়সের একটি বিশেষ ভাবনা ও প্রভাবিত ভাবের সীমানা দ্বারা রচিত পদ হিসাবে ঘোষণা করেছেন। তিনি মনে করেন নির্দিষ্ট সীমারেখায় মনের স্বাধীনতা খর্ব হয়। ফলে দেবব্রত দত্তের মতের সাথে কবির মতামতের একটি জায়গায় মিল তা হলো-কবির নিজস্বতায়। তাই বৈষ্ণবতা

বা বৈষ্ণবপদ দ্বারা প্রভাবিত হলেও, কবি নিজেই বলে গেছেন ভানুসিংহের সঙ্গে বৈষ্ণব চিত্তের অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা নেই। তিনি বৈষ্ণবসাহিত্য পাঠ করেছিলেন সাহিত্যরস আহরণের জন্য এর তত্ত্বের জন্য নয়।

সুতরাং, বলতে পারি কবির 'প্রেমচেতনায়' *ভানুসিংহের পদাবলী* বেশ প্রাসঙ্গিক। কারণ, বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধা ও কৃষ্ণের লীলার ভক্তিরসের ভাবটা প্রাধান্য পেত। কবিকে বেশি আকৃষ্ট করেছিল পদাবলীর ছন্দ, যা পরবর্তীতে পদাবলী রচনার অন্যতম প্রেরণা। বাল্যকালে বৈষ্ণব পদাবলীর ব্রজবুলি ভাষা সম্পূর্ণ বুঝতে না পারলেও সেই 'ধ্বনি বা সুর' মানুষের মনের অকৃত্রিম প্রতিধ্বনির রূপ নিয়ে যে পদাবলী আকার ধারণ করেছিল, সেই পদাবলী রবীন্দ্রনাথকেও আকৃষ্ট করেছিল বলে আমরা দেখতে পাই। প্রাচীন পদকর্তাদের প্রতি কবির আগ্রহ বালক বয়স থেকেই ছিল। বিদ্যাপতির প্রতি তাঁর অনুরাগ খুব বেশি ছিল। প্রায় বর্ষার দিনে তিনি 'ভরা বাদর মাহ ভাদর' গানটি গাইতেন, গানটির সুরকারও কবি নিজে। একদিকে জয়দেব, অপরদিকে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস প্রমুখ বৈষ্ণব পদকর্তাদের প্রভাবে *ভানুসিংহের পদাবলী* সৃষ্টি হলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় ছিলেন স্বতন্ত্র। বৈষ্ণব পদকর্তাদের রচনায় শুধুমাত্র কৃষ্ণ লীলা বিষয়ক ভক্তিরস পাওয়া যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহের পদাবলীতে ভক্তিরস ও ভাগবৎ প্রেমের রূপ ছাপিয়ে লৌকিক প্রেম হাসি- ঠাট্টা, সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা প্রভৃতি বিষয়বস্তুর প্রকাশ পাওয়া গেল। কবির রাধিকার মানবপ্রেম ও চির আকুলতাই আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই-

"ভানুসিংহের রাধার মধ্যে 'অজানার' প্রশ্নই মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে আর বিদ্যাপতির রাধার মধ্যে 'অতৃপ্ততা' প্রকট রূপ ধারণ করেছে। ভানুসিংহের পদাবলীর সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর রসের সামঞ্জস্যত পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু ভাবের বিচারে ভানুসিংহের পদাবলী হালকা।"[১২]

তবে যতই ভাব হালকা হোক না কেন 'প্রেমচেতনায়' এর প্রভাব কিছুটা হলেও কিশোর কবির মনে পড়েছিল। তাইতো প্রেমপর্যায়ের গানে তিনি অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন ভানুসিংহের পদাবলী-

মরণ রে, তুঁহুঁ মম শ্যামসমান....
.. ভানু ভণে, 'আয়ি রাধা, ছিয়ে ছিয়ে
চঞ্চল চিত্ত তোহারি।
জীবনবল্লভ মরণ-অধিক সো,
অব তুঁহুঁ দেখ বিচারি।

১৮৮১ সালে মাত্র বিশ বছর বয়সে রচিত গান। কবি গানে মৃত্যুকে শ্যামের সাথে তুলনা করেছেন। রবীন্দ্রচিন্তায় মহাজীবনের রূপান্তর। মৃত্যুর মধ্যদিয়ে জীবনের প্রকাশ ও মাধুর্য রক্ষিত হয়। তাই বালক কবির দৃষ্টিতে মৃত্যু হল শান্তি-পারাবার। এত অল্প বয়সে এত গভীর উপলব্ধি তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে এসকল গুণী কবিদের রচনার সান্নিধ্যে এসে। তাই আমি মনে করি, পরবর্তীতে প্রেমপর্যায়ের গানের রচনায় কবির এই কিশোর বয়সের

ভাবনাগুলো তাঁর প্রেমভাবনার মানস নির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। বিলেত যাওয়ার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ আমেদাবাদে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের কাছে কয়েক মাস ছিলেন। বৌঠাকুরণ এবং তাঁর ছেলেরা তখন ইংল্যান্ডে, ফলে বাড়ি ছিল শূন্য। তাঁর বাড়িটি ছিল পুরো রাজপ্রাসাদের মত। সময় কাটানোর একমাত্র অবলম্বন ছিল-বাড়ির চার পাশের সৌন্দর্য অবলোকন করা, প্রকৃতির সাথে নিবিড় সময় কাটানো এবং লেখালেখি করা। *'জীবনস্মৃতি'*তে কবির আমেদাবাদের স্মৃতির কথা মনে করে বলেন-

"শুক্লপক্ষের গভীর রাত্রে এই নদীর দিকের প্রকাণ্ড ছাদটাতে একলা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো আমার আর-একটা উপসর্গ ছিল। এই ছাদের উপর নিশাচর্য করিবার সময়ই আমার নিজের সুর দেওয়া সর্বপ্রথম গানগুলি রচনা করেছিলাম। তাহার মধ্যে- 'বলি ও আমার গোলাপবালা' গানটি এখনো আমার কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আসন রাখিয়াছে।"[১৩]

মাসখানেক আমেদাবাদে থাকার পর রবীন্দ্রনাথকে বোম্বাইয়ে সত্যেন্দ্রনাথের এক বন্ধুর কাছে পাঠিয়ে দেন মেজ দাদা। সেখানে কবির পরিচয় হয় আন্না তরখড়ের সাথে (Anna)। কবির থেকে বয়সে কিছু বড় হলেও ইংরেজি শিক্ষা চর্চার সুবাদে ভালো বন্ধুত্ব তৈরী হয়েছিল। অন্নপূর্ণা তরখড় (Anna) রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ও গানের ভীষণ ভক্ত ছিলেন। তরুণী একদিন কবিকে বলেছেন-

"তোমার গান শুনলে আমি বোধ হয় আমার মরণদিনের থেকেও প্রাণ পেয়ে জেগে উঠতে পারি।"[১৪]

কবিগুরু আন্না তরখড় সম্পর্কে তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন-

"আমার বিদ্যে সামান্যই, আমাকে হেলা করলে দোষ দেওয়া যেতে পারত না। তা করেন নি। পুঁথিগত বিদ্যে ফলবার মতো পুঁজি ছিল না, তাই সুবিধে পেলেই জানিয়ে দিতুম যে কবিতা লেখবার হাত আমার আছে। আদর আদায় করবার ঐ ছিল আমার সবচেয়ে বড় মূলধন। যাঁর কাছে নিজের এই কবিআনার জানান দিয়েছিলেম তিনি সেটাকে মেপেজুখে নেন নি, মেনে নিয়েছিলেন।"[১৫]

রবীন্দ্রনাথ তার নামকরণ করেছিলেন নলিনী। ১৮ বছর বয়সে নলিনীকে নিয়ে কবি গান রচনা করেছিলেন-

শুন নলিনী, খোল গো আঁখি
ঘুম এখনো ভাঙিল না কি!
দেখো, তোমারি দুয়ার- পরে
সখী, এসেছে তোমারি রবি ॥...

এই সময়ে কবির চিত্তে প্রেমানুভূতি খুবই স্পষ্ট ছিল। যদি বলি ব্যক্তি কেন্দ্রিক প্রেমানুভূতির বহিঃপ্রকাশ, তা হলেও যৌক্তিক হবে। এই বয়সে কবির বিশ্বপ্রেমবোধের সূচনা এবং ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রেমের প্রকাশটাই বেশি দেখা যায়। কারণ, প্রথম জীবনের শুরুতে একটা আবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে কবি জীবন কাটিয়েছিলেন। বাইরের আলো, রূপ, সৌন্দর্যকে কবি প্রত্যক্ষ করেনি। পিতার সাথে হিমালয় যাত্রার মাধ্যমে কবির বহিঃবিশ্বের দেখা মেলে। এ সময় কবি প্রকৃতিকে সরাসরি অনুভব করতে জানেন, ধীরে ধীরে বিলেত যাওয়ার পূর্বে ওখানে নানান

রকম অভিজ্ঞতা এবং মানুষের সঙ্গ তাঁকে তাঁর অনুভূতির বোধের মাত্রা বাড়িয়ে তোলে, যা কবিকে কবির জীবনকে উপভোগ করতে শেখায়।

বিলেত থাকা অবস্থায় কবি *ভগ্নহৃদয়* লেখা শুরু করেন এবং এর শেষের অংশ দেশে এসে লেখেন। রবীন্দ্রনাথের 'পনেরো-ষোলো' হতে 'বাইশ-তেইশ' বছর পর্যন্ত সময়টা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কাব্য রচনা ও গান রচনায় এই সময় গুলোর অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি তাঁর পরবর্তী জীবন-ভাবনায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। পরবর্তী জীবনে কবির এই সকল কাব্যের প্রেমের অনুভূতিগুলিই পরিণত রূপে প্রকাশ পায়-বিশ্বপ্রেম ও জীবনদেবতায়। যেমন- *রুদ্রচণ্ড* নাটকে অমিয়া ও চাঁদ কবির কাহিনী। *ভগ্নহৃদয়ে* কবি ও কিশোরী মুরালার কাহিনী। এ সম্পর্কে ত্রিশ বছর বয়সে কবি *জীবনস্মৃতিতে* বলেছেন-

"ভগ্নহৃদয় যখন লিখতে আরম্ভ করেছিলেম তখন আমার বয়স আঠারো। বাল্যও নয়, যৌবনও নয়। বয়সটা এমন একটা সন্ধিস্থলে যেখান থেকে সত্যের আলোক স্পষ্ট পাবার সুবিধা নেই। একটু-একটু আভাস পাওয়া যায় এবং খানিকটা-খানিকটা ছায়া। এই সময়ে সন্ধ্যাবেলাকার ছায়ার মতো কল্পনাটা অত্যন্ত দীর্ঘ এবং অপরিস্ফুট হয়ে থাকে। সত্যকার পৃথিবী একটি আজগবি পৃথিবী হয়ে উঠে। মজা এই, তখন আমারই বয়স আঠারো ছিল তা নয়- আমার আশপাশের সকলের বয়স যে আঠারো ছিল। আমরা সকলে মিলেই একটা বস্তুহীন ভিত্তিহীন কল্পনালোকে বাস করতেম। সেই কল্পনালোকের খুব তীব্র সুখদুঃখও স্বপ্নের সুখদুঃখের মতো। অর্থাৎ, তার পরিমাণ ওজন করবার কোনো সত্য পদার্থ ছিল না, কেবল নিজের মনটাই ছিল, তাই আপন মনে তিল তাল হয়ে উঠত।"[১৬]

ভগ্নহৃদয়ে যে গানগুলি আছে তাতে প্রেমের গানে 'প্রেমিকচিত্ত ও প্রকৃতির সৌন্দর্য' দুটোই রূপ খুব চমৎকার ফুটে উঠতে দেখা যায়। যেমন বসন্তসমীরণকে বলছে তোর জীবন তো সুখের নয়। দিবা-রাত্রি-নদী-লতা কে বসন্তের বাতাসে তাকে মাতিয়ে রাখতে হয়। যেমন-

তুইরে বসন্তসমীরণ।
তোর নহে সুখের জীবন ॥
কিবা দিবা কিবা রাতি পরিমলমদে মাতি
কাননে করিস বিচরণ...
... তোর নহে সুখের জীবন ॥

আবার, কবির চিত্তের দুঃখবোধ প্রকাশ পায় এভাবে-

ক্ষমা করো মোরে সখী, শুধায়ো না আর-
মরমে লুকানো থাক মরমের ভার ॥
... দিন-দিন পূজা করি শুকায়ে পড়ে সে ঝরি,
আজন্ম-নীরবে বহি যায় প্রাণ তার ॥

কাব্যগীতি গুলোতে যে বিরহবোধ ও মরমের বেদনা প্রকাশ পায়, তা সম্পর্কে অধ্যাপক শ্রী প্রমথনাথ বিশী বলেছেন-

"নলিনী, তাহার প্রণয়িগণ, ললিতা, মুরলী, কবি, অনিল সকলেই ভগ্নহৃদয়, প্রেমের চোরা- পাহাড়ের আঘাতে বানচাল হইয়া সকলের- হৃদয় ভগ্নহৃদয়।"[১৭]

সুতরাং উপরের আলোচনার পর আমরা বলতে পারি *কবিকাহিনী*, *বনফুল*, *ভগ্নহৃদয়*, *রুদ্রচণ্ড* সবই এক ছাঁচে তৈরি, সবগুলি কল্পনা বিলাসী কবির তপ্ত উচ্ছ্বাসে ভারাক্রান্ত। সবগুলোর নায়কই কবি নিজেই। যেন মনে হয় মনের সুপ্ত বাসনা ও সংগ্রামের এক আত্মকথনই প্রকাশ করেছেন তাঁর রচনায়। পরবর্তীতে *সান্ধ্যসংগীত*, *প্রভাতসংগীত*, *প্রকৃতির প্রতিশোধ*, *ছবি ও গান*, *কড়ি ও কোমল* প্রভৃতিতে কবির নিজস্ব অনুভূতি ও কল্পনার যে প্রকাশ পায়, তা তাঁর প্রেমচেতনায় প্রেমের গানের ভাবনায় পরবর্তী জীবনে রসদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। নিম্নে '*জীবনস্মৃতি*'র কিছু স্মৃতিচারণা তুলে ধরছি-

হৃদয়-অরণ্য নামে কবিতা হতে কবির অনুভূতি-

"এইরূপে বাহিরের সঙ্গে যখন জীবনটার যোগ ছিল না, যখন নিজেই হৃদয়েরই মধ্যে আবিষ্ট অবস্থায় ছিলাম, যখন কারণহীন আবেগ ও লক্ষ্যহীন আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আমার কল্পনা নানা ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতেছিল তখনকার অনেক কবিতা নূতন গ্রন্থাবলী হইতে বর্জন করা হইয়াছে; কেবল সান্ধ্যসংগীতে-প্রকাশিত-কয়েকটি কবিতা হৃদয়-অরণ্য বিভাগে স্থান পাইয়াছে।"[১৮]

আবার বলেছেন-

"মানুষের মধ্যে একটা দ্বৈত আছে। বাহিরের ঘটনা, বাহিরের সমস্ত চিন্তা ও আবেগের গভীর অন্তরালে যে- মানুষটা বসিয়া আছে, তাহাকে ভালো করিয়া চিনি না ও ভুলিয়া থাকি, কিন্তু জীবনের মধ্যে তাহার সত্তাকে তো লোপ করিতে পারি না। বাহিরের সঙ্গে তাহার অন্তরের সুর যখন মেলে না, সামঞ্জস্য যখন সুন্দর ও সম্পূর্ণ হইয়া ওঠে না তখন সেই অন্তরনিবাসীর পীড়ার বেদনায় মানসপ্রকৃতি ব্যথিত হইতে থাকে। এই বেদনাকে বিশেষ কোনো নাম দিতে পারি না। ইহার বর্ণনা নাই, এইজন্য ইহার রোদনের ভাষা তাহা স্পষ্ট ভাষা নহে; তাহার মধ্যে অর্থবদ্ধ কথার চেয়ে অর্থহীন সুরের অংশই বেশি। সান্ধ্যসংগীতে যে বিষাদ ও বেদনা ব্যক্ত হইতে চাহিয়াছে তাহার মূল সত্যটি সেই অন্তরে রহস্যের মধ্যে।"[১৯]

আবার *প্রভাতসংগীত* সম্পর্কে বলেছেন-

"মোহিতবাবুর গ্রন্থবলীতে প্রভাতসংগীতের কবিতারগুলিকে 'নিষ্ক্রমণ' নাম দেওয়া হইয়াছে। কারণ তাহা হৃদয়ারণ্য হইতে বাহিরের বিশ্বে প্রথম আগমনের বার্তা। তার পরে সুখ-দুঃখ-আলোক-অন্ধকারের সংসারপথের যাত্রী এই হৃদয়টার-সঙ্গে একে-একে খণ্ডে খণ্ডে নানা সুরে ও নানা ছন্দে বিচিত্রভাবে বিশ্বের মিলন ঘটিয়াছে। অবশেষে এই বহুবিচিত্রের নানা বাঁধানো ঘাটের ভিতর দিয়া পরিচয়ের ধারা বহিয়া চলিতে চলিতে নিশ্চই আর-একদিন আবার একবার অসীম ব্যাপ্তির মধ্যে গিয়া পৌঁছিবে, কিন্তু সেই ব্যাপ্তি অনির্দিষ্ট আভাসের ব্যাপ্তি নহে, তাহা পরিপূর্ণ সত্যের পরিব্যাপ্তি।"[২০]

আবার বলেছেন-

"আমার শিশুকালের বিশ্বকে প্রভাতসংগীতে যখন আবার পাইলাম তখন তাহাকে অনেক বেশি পাওয়া গেল। এমনি করিয়া প্রকৃতির সঙ্গে সহজ মিলন বিচ্ছেদ ও পূনর্মিলনে জীবনের প্রথম অধ্যায়ের পালা শেষ হইয়া গেল । শেষ হইয়া গেল বলিলে মিথ্যে বলা হয়। এই পালাটাই আবার আরও একটু বিচিত্র হইয়া শুরু হইয়া, আবার আরও একটা দুরূহতর সমস্যার ভিতর দিয়া বৃহত্তর পরিণামে পৌঁছিতে চলিল।"[২১]

কবির *'জীবনস্মৃতি'*র স্মৃতিচারণ থেকে বোঝা যায়, কবির সমগ্র জীবনের সাহিত্য রচনার মূলভিত্তিই ছিলো প্রথম জীবনের জীবনবোধ ও প্রেমচেতনার অনুভূতি। যেখানে কবির মানস-সুন্দরী পরবর্তীতে জীবনদেবতায় রূপ নেয়। প্রথম জীবনের প্রাথমিক পর্বের পর কবির জীবনে ঘটে যাওয়া নানান ঘটনা, পারিবারিক মূল্যবোধ, জমিদারির প্রয়োজনে বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান, সকলেই তাঁর প্রেমচেতনায় নতুন নতুন অভিজ্ঞতায় নানান রূপ নেয়। সুখ, দুঃখ, প্রাপ্তি, না পাওয়া সকলই জীবনের নিত্য ঘটে যাওয়া বিষয়। জীবন গতিময়, সেই গতির সাথে তাল মিলিয়ে কবি জীবনে সামনের দিকে এগিয়ে গেছেন। লিখেছেন অনেক গান, কাব্য, কবিতা, নাটক ইত্যাদি। বিলেত প্রবাসকালে কবির অনেক শ্বেতাঙ্গিনী সুন্দরীর সাথে আলাপ হয়েছিল। সকলের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রথম বিদেশিনী ছিলেন লুসি স্কট। বিদেশিনীদের সাথে কবির সম্পর্ক ছিল একান্তই মানসিক প্রশান্তির। এমন সম্পর্কে কবির সান্নিধ্যে ছিলেন 'লং' অথবা 'মুল' অথবা 'ভিভিয়ান'। তাঁরা সকলে রবীন্দ্রনাথকে নানান দৃষ্টিভঙ্গির আবেগে ভালোবাসতেন। প্রথম জীবনে মারাঠী মেয়ে আনা (Anna), নতুন বৌঠান (যাকে শ্রীমতি 'হে' সম্বোধন করেছেন), আবার কবির মানসপটে কখনো বিলেতে লুসি, আর্জেন্টিনার ভিক্তোরিয়া, জাপানের তোমি, কাশীর রানু কিংবা শেষ জীবনে পূরীরর হেমন্তবালা সকলেই কোন না কোন ভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রেমিক চিত্তে গোপনচারিণী বা স্বপনচারিনী কিংবা বিদেশিনী বেশে অবস্থান করেছেন। আর তাইতো মৃত্যুর চার বছর আগে সকল কিশোরী স্বপনচারীদের কথা স্মরণ করে 'প্রান্তিক' এর একটি কবিতায় বলেছেন-

"একেঁছি বুকের রক্তে মানসীর ছবি বারবার
ক্ষণিকের পটে মুছে গেছে রাত্রির শিশির জলে।...
... আছে তারা সূক্ষ্মরেখা স্বপনের চিত্রশালা জুড়ে,
আছে তারা অতীতের শুষ্কমাল্যগন্ধে বিজড়িত...
... আজি বিদায়ের বেলা
স্বীকার কবির তারে, সে আমার বিপুল বিস্ময়।"[২২]

তাঁর গানে যদি ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রেমভাবনার কথা বলি তাহলে তাঁদের প্রভাব পাওয়া যাবে। তবে রবীন্দ্রনাথ এমন একজন কবি ছিলেন যে, তিনি তাঁর জীবনের শোক, প্রেমানুভূতি সকলকে শুধু ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথে আবদ্ধ করে রাখেননি। তিনি জীবনকে যেভাবে অনুভব করতেন তা সাধারণ মানুষের অসাধ্য। কবি তাঁর সকল অনুভূতিকে

এক অসীম সাধনায় উন্নীত করেছেন। সীমার মাঝে অসীমের যোগ ঘটিয়ে দেন, তাঁর লেখনীতে। রবীন্দ্রনাথের *গীতবিতানে* সকল পর্যায়ে যত গান আছে তা কবির এই জীবন ভাবনার প্রকাশ হিসেবে পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের মতো কবিপ্রতিভা আমরা তাঁর সময়ে কোনো গীতিকারের মধ্যে এতটা সফলভাবে প্রকাশ ঘটতে দেখিনি। প্রথম বয়স থেকে শেষ পর্যন্ত অসামান্য সৌন্দর্যচেতনায় পরিণতশ্রী মাধুর্যে, সুনিপুণ কারুকলায় রবীন্দ্রনাথের গান সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কাব্যগীতি।

তথ্যসূত্র

১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড*, প্রকাশনা : বিশ্বভারতী, প্রকাশকাল : বৈশাখ ১৪২৪, পৃ. ৭৮

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি*, প্রকাশনা : বিশ্বভারতী, প্রকাশকাল : কার্তিক ১৪২৪, পৃ. ৯২

৩. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড*, প্রকাশকাল : বৈশাখ ১৪২৪, পৃ. ৬৩

৪. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড*, প্রকাশনা : বিশ্বভারতী, প্রকাশকাল : বৈশাখ ১৪২৪, পৃ. ৮৫

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি*, প্রকাশনা : বিশ্বভারতী, প্রকাশকাল : কার্তিক ১৪২৪, পৃ. ৮৫

৭. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড*,প্রকাশনা : বিশ্বভারতী, প্রকাশকাল : বৈশাখ ১৪২৪, পৃ. ৭১

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১, ৭২

৯. প্রমথনাথ বিশী, *রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ*, প্রকাশনা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রকাশকাল : চৈত্র ১৪২৫, পৃ.৩৩

১০. দেবব্রত দত্ত, *সঙ্গীত তত্ত্ব (রবীন্দ্র প্রসঙ্গ)*, প্রকাশনা : দেবব্রত দত্ত ট্রাস্ট, প্রকাশকাল : কলিকাতা ২০০২, পৃ.২৮

১১. প্রাগুক্ত, পৃ.২৮

১২. দেবব্রত দত্ত, *সঙ্গীত তত্ত্ব (রবীন্দ্র প্রসঙ্গ)*, প্রকাশনা : দেবব্রত দত্ত ট্রাস্ট, প্রকাশকাল : একাদশ সংস্করণ ২০০২, পৃ. ৬৯, ৭০

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি*, প্রকাশনা : বিশ্বভারতী, প্রকাশকাল : কার্তিক ১৪২৪, পৃ. ৯৫

১৪. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড*,প্রকাশনা : বিশ্বভারতী, প্রকাশকাল : বৈশাখ ১৪২৪, পৃ. ৮৮

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি*, প্রকাশনা : বিশ্বভারতী, প্রকাশকাল : কার্তিক ১৪২৪, পৃ. ১০৮

১৭. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড*, প্রকাশনা : বিশ্বভারতী, প্রকাশকাল : বৈশাখ ১৪২৪, পৃ. ১১৩

১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি*, প্রকাশনা : বিশ্বভারতী, প্রকাশকাল : কার্তিক ১৪২৪, পৃ. ১১৯

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫

২২. পৃথ্বীরাজ সেন, *১০ নারীর হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ*, প্রকাশনা : প্রিয়া বুক হাউস, প্রকাশকাল : কলকাতা বইমেলা ২০১৭, পৃ. ৩৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রেম : মিলন ও বিরহ

গীতবিতানে প্রেমপর্যায়ের গানের সংখ্যা তিনশত পঁচানব্বইটি (৩৯৫)। প্রেমপর্যায়ের গানে আমরা দুটো উপবিভাগ পাই। একটি হল 'গান' (১-২০) এবং অপরটি 'প্রেমবৈচিত্র্য' (২৮-৩৯৫)। এই অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানের 'মিলন ও বিরহ' নিয়ে আলোচনা করব। কবি গুরুর প্রেমের গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, তাঁর বেদনায়- বিরহবেদনার দুঃসহ অশ্রুধারা সেগুলোকে আগাগোড়া পূর্ণ করে রেখেছে।

গীতবিতান গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়েছিল। *গীতবিতান* যখন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো তখন সংকলন কর্তারা সত্ত্বরতার তাড়নায় গানগুলির মধ্যে বিষয়ানুক্রমিক শৃঙ্খলাবিধান করতে পারেননি। তাই পরবর্তী সংস্করণে ভাবের অনুষঙ্গ রক্ষা করে গানগুলোকে সাজানো হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানগুলোকে সুরের সহযোগিতা ব্যতিরেকেও কাব্যসংগীত অর্থাৎ গীতিকবিতার ধর্মেই *গীতবিতানের* পাঠকদের সমাদরের উপকরণ রূপে দেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ গানগুলির মধ্যে 'ভাবের অনুষঙ্গ রক্ষা' করার ফলে বিষয় শৃঙ্খলা কেবল রসবোধেরই উন্নতি করে নাই বরং কবির মেধাবী ভাবনা শিল্পের ধারাবাহিকতার সঙ্গেও পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তবে বিষয়ানুসারে *গীতবিতানে* গানগুলিকে বিন্যস্ত করার ফলে গানগুলির ঐতিহাসিক রচনাকালগত ক্রমটি পাওয়া যায় না। তেমনি পাওয়া যায় না বয়সবৃদ্ধির ধারাবাহিকতায় তাঁর গভীর অনুভূতি ও ভাবের পরিবর্তন। তথাপি কবির স্বরচিত বিষয় নির্দেশে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসংগীত গুলি তাঁর কবি কর্মেরই এক অতি গভীর পান্ডিত্যের বশীভূত হয়েছে।

গীতবিতানে গানগুলিকে কালানুক্রমিকতায় সাজানো নাই, তাই প্রেমপর্যায়ের গানগুলিতে প্রেমচেতনার ধারাবাহিক চিত্রটি পাই না। গানগুলিতে প্রেমচেতনার ধারাবাহিক চিত্রটি ফুটিয়ে তোলার জন্য এবং কবির 'মিলন ও বিরহের' স্বরূপটি বয়সের সাথে সাথে কেমন রূপ নিয়েছে তা বোঝার জন্য গানগুলির কালানুক্রমিক তালিকা করেছি। রবীন্দ্রনাথের প্রেমপর্যায়ের গানগুলিকে তিনটি পর্বে ভাগ করেছি। গানগুলি তিনি সতেরো বছর থেকে আটাত্তর বছর বয়স পর্যন্ত রচনা করেছেন। কালানুক্রমিক তালিকার সুবিধার্থে ১৬ বছর থেকে ৭৮ বছর বয়স পর্যন্ত, ২১ বছরের ব্যবধান করে তিনটি পর্বে গানগুলোকে বিভক্ত করেছি এভাবে-

প্রথম পর্ব : ১৬ (১৮৭৭) - ৩৬ (১৮৯৭)

দ্বিতীয় পর্ব : ৩৭ (১৮৯৮) - ৫৭ (১৯১৮)

তৃতীয় পর্ব : ৫৮ (১৯১৯) - ৭৮ (১৯৩৯)

কালানুক্রমিক তিনটি পর্বের বিশ্লেষণের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রেমপর্যায়ের গানে দুটি উপবিভাগ 'গান' ও 'প্রেমবৈচিত্র্য' নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। গীতসংখ্যায় গানবিষয়ক ২৭টি এবং প্রেমবৈচিত্র্য সংখ্যায় ৩৬৮টি গান রয়েছে। 'বিরহ ও বেদনা' কবির প্রেমের গানের মূল উপাদান। তাই তো 'প্রেমবৈচিত্র্য' শব্দের মধ্যেই এই

'মিলন ও বিরহের' বিচিত্রতা নির্দেশ করে-গানের বাণী ও সুরে। তাই কবি প্রেমের গানে আলাদা করে পূজাপর্যায়ের গানের মত উপবিভাগ করার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। তবে একটি কথা গুরুত্বসহকারে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, কবির নিভৃত মনে কোন গান কী গভীর ও সূক্ষ্ম-যোগসূত্রে পরস্পর শ্রেণীবদ্ধ ছিল তা আমাদের পক্ষে আবিষ্কার কিংবা ব্যাখ্যা করা কঠিন। একমাত্র কবিই জানেন তাঁর অন্তরের ব্যথা। আমরা শুধু সময়, প্রেক্ষাপট, কথা ও সুর উপলব্ধি করে তাঁর গানের একটি প্রাথমিক ভাব ব্যাখ্যা করতে পারি। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান গুলিতে দেখা যায় প্রেমিকা কোথাও স্পষ্ট রেখায় অঙ্কিত নয়, সে শুধু ইঙ্গিত প্রতিমা। *গীতবিতানে* প্রেমপর্যায়ের গানে দুটি উপবিভাগের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে কালানুক্রমিক তালিকা থেকে বয়স অনুযায়ী প্রেমের গানের 'মিলন ও বিরহ' রূপটি বর্ণনা করব। 'গান' উপপর্যায়ের গানগুলির মধ্যে প্রকৃতির নান্দনিক সৌন্দর্য ও অনুভূতির প্রকাশ পাওয়া যায়। নৈসর্গিক প্রেম ও মানবীয় প্রেমের পরস্পর মিলন ঘটেছে গানগুলিতে। প্রকৃতির সুরে তিনি প্রেমের অনুভূতিকে প্রকাশ করেছেন।

প্রেমপর্যায়ের প্রথম গান 'চিত্ত পিপাসিত গীতসুধার তরে', এছাড়া 'আমার মনের মাঝে যে গান বাজে শুনতে কি পাও', 'দিয়ে গেনু বসন্তের ঐ গানখানি', 'এই কথাটি মনে রেখো', 'ছুটির বাঁশি বাজল যে ওই নীল গগনে' এমন আরও বেশ কয়েকটি গানে কবি তাঁর প্রেমের অনুভূতিকে প্রকৃতির সুরে প্রকাশ করেছেন। যেমন, একটি গান আমরা ব্যাখ্যা করি-

তোমায় গান শোনাব তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখ
ওগো ঘুম-ভাঙানিয়া
'বুকে চমক দিয়ে তাই তো ডাক'
ওগো দুখজাগানিয়া॥
এল আঁধার ঘিরে, পাখি এল নীড়ে,
তরী এল তীরে-
শুধু আমার হিয়া বিরাম পায় নাকো
ওগো দুখজাগানিয়া॥
আমার কাজের মাঝে মাঝে
কান্নাধারার দোলা তুমি থামতে দিলে না যে॥
আমায় পরশ ক'রে প্রাণ সুধায় ভ'রে
তুমি যাও যে সরে-
বুঝি আমার ব্যথার আড়ালেতে দাঁড়িয়ে থাক
ওগো দুখজাগানিয়া॥

এই গানটি রবীন্দ্রনাথের বাষট্টি (৬২) বছর বয়সে রচিত। যেখানে কবির প্রেমের অনুভূতির পরিণত প্রকাশ ঘটেছে। প্রেমিকা এখানে 'দুখজাগানিয়া ও ঘুমভাঙানিয়া' হিসাবে ধ্বনিত হয়েছে। কবির নির্ঘুম রাত্রির 'ঘুমভাঙানিয়া' কে তিনি অনুভব করেন তাঁর প্রতিটি কাজে। তাঁর সুখ, দুঃখের কান্নাধারা যেন 'দুখজাগানিয়া' থামতে দেয় না। গভীর নির্ঘুম নিশীথে প্রেমিকাকে অনুভব করেন যে আড়ালে সে কবির ব্যথা কে পরশ করে প্রাণ সুধায় ভরিয়ে দিয়ে যায়। গান উপ-পর্যায়ের আরেকটি গান-

কাল রাতের বেলা গান এল মোর মনে
তখন তুমি ছিলে না মোর সনে॥
যে কথাটি বলব তোমায় বলে কাটল জীবন নীরব চোখের জলে
সেই কথাটি সুরের হোমানলে উঠল জ্বলে একটি আঁধার ক্ষণে-
তখন তুমি ছিলে না মোর সনে॥
ভেবেছিলেম আজকে সকাল হলে
সেই কথাটি তোমায় যাব বলে।
ফুলের উদাস সুবাস বেড়ায় ঘুরে পাখির গানে আকাশ গেল পূরে,
সেই কথাটি লাগল না সেই সুরে যতই প্রয়াশ করি পরানপণে
যখন তুমি আছ আমার সনে॥

গানটি কবিগুরুর চুয়ান্ন (৫৪) বছর বয়সে রচিত। মধ্যবয়সে রচিত এই গানে কবি তাঁর প্রিয়তমকে না বলা কথার দুঃখবোধ প্রকাশ করেছেন। যখন কবি গানের সুরে মনের কথাগুলি ব্যক্ত করতে চান, তখন প্রিয়তমকে পাশে পান না। নীরব চোখের জলে তাঁর জীবন কেটে যায়। ফুলের সুবাস আর পাখির গানে যখন আকাশ ভরে ওঠে, তেমনি সকালে কবি কথাটি প্রিয়তমকে বলে যেতে চান। অনেক প্রয়াসেও কবি ফুলের সুবাস আর পাখির গানে মুখরিত আকাশে না বলা কথার সুরটি আর প্রকাশ করতে পারলেন না। কারণ, কবি তখন অনুভব করেছেন প্রিয়তম তাঁর অন্তরে নিজের কাছেই বিরাজমান।

গান উপপর্যায়ে প্রথম গানটি চৌত্রিশ (৩৪) বছর বয়সে রচিত। বাকি ২৬ টি গান পরিণত ও মধ্যবয়সে রচিত। তাই গানগুলোতে মিলনের বা বিরহবোধের প্রত্যাশাগুলি বেশ পরিণত। প্রকৃতির সুরের সাথে তিনি তাঁর আপন অনুভূতিগুলোকে যত্ন সহকারে প্রকাশ করেছেন। এ যেন প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে ফেলে আসা অনুভূতির এক অপ্রাপ্তির আবেগ। যা কখনো হারিয়ে যায়, না পাওয়ার বেদনায় আবার কখনো দীর্ঘসময়ে অন্তরে আগলে রাখা ভালোবাসার মিলন, যেন ভালোবাসার মানুষটি তাঁর পাশেই আছেন।

এবার আরেকটি উপবিভাগ 'প্রেমবৈচিত্র্য' নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। এই উপবিভাগে অনেক গানকে পরস্পর-সংস্থাপনের দ্বারা কবিগুরু কিছু কিছু গানের ভাবের ভারসাম্য রক্ষা করেছেন। যেমন-

"প্রেমপর্যায়ের ১৪৮-১৭৯ পর্যন্ত সংখ্যক চিহ্নিত গানগুলি বিদায় সংক্রান্ত। গানগুলির মধ্যে বিদায়ের আশঙ্কা, বিদায়-প্রার্থনা,

বিদায়ের পর স্মৃতিবেদনার উচ্ছ্বল প্লাবন, বিদায়ের পূর্বে স্মৃতিরক্ষার করুণ মিনতি, না-পাওয়ার জন্য কাতর অনুনয়, প্রভাত প্রায়াহ্নে অভিসারিকার ক্লান্ত অথচ সন্ত্রস্ত বিদায়, ক্ষণআগমন ও মুহূর্ত-বিদায়ের জন্য অনুযোগ, বিদায়ের অনিবার্যতা সত্ত্বেও প্রেমের আকর্ষণের দ্বিধা, বিদায়মুহূর্তে কাতরতা, বিদায়ের নিশ্চিত অনিবার্য সত্য-এমন সূক্ষ্মতর প্রসঙ্গে গানগুলিকে চিনে নেওয়া যায়। তবে তিনি নিজেই আবার বলেছেন- রবীন্দ্রসংগীতে এই ধরনের বিষয় বিভাগ বস্তুত অবান্তর।... কারণ মিষ্টতার ইতরবিশেষ আছে কিন্তু মাধুরীর কোনো স্তরপরম্পরা নেই।... প্রেমপর্যায়ে ১৯৮-২০৩ সংখ্যক গানগুলির বিষয়, প্রেমে নিঃসংশয় নির্ভরতা সংকোচের অবসানে প্রেমের সুনিশ্চিত উপলব্ধি। এবং ২৫৯-২৬৫ সংখ্যক গানগুলিকে বলা যায় ভাবসম্মিলন। বিরহের মধ্যে মিলনের ব্যঞ্জনা এগুলিতে আভাসিত।"[১]

গীতবিতানে প্রেমপর্যায়ের অন্তর্গত প্রেমবৈচিত্র্য বিভাগের প্রথম গান-

বিরস দিন বিরল কাজ, প্রবল বিদ্রোহে
এসেছে প্রেম, এসেছে আজ কী মহা সমারোহে ॥
একেলা রই অলসমন, নীরব এই ভবনকোণ,
ভাঙিলে দ্বার কোন্ সে ক্ষণ অপরাজিত ওহে ॥
কানন-'পর ছায়া বুলায়, ঘনায় ঘনঘটা।
গঙ্গা যেন হেসে দুলায় ধূর্জটির জটা।
যেথা যে রয় ছাড়িল পথ, ছুটালে ওই বিজয়রথ
আঁখি তোমার তড়িতবৎ ঘনঘুমের মোহে ॥

গানটি কবির পয়ষট্টি বছর বয়সে রচিত গান। এই গানে তিনি প্রেমের আগমনের রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে প্রেমের আগমন বিশেষ সমারোহের মাধ্যমে ঘটেছে। 'মহুয়া' কবিতার গীতরূপ এই গানটি। পূরবীর 'কিশোর প্রেম' কবিতায় সহসা প্রৌঢ় বয়সে কয়েকটি স্মৃতিবহু অনুষঙ্গের সংস্পর্শে এসে কবির মনে পুরাতন প্রেমের করুণ ব্যকুলতার জোয়ার বেগ নেমে এসেছিল। তারপর থেকে শেষ জীবন পর্যন্ত সেই প্রেম বিরস দিন, কর্মহীন অবকাশ, প্রৌঢ়তার অলস মন্থর প্রহরগুলিকে অকারণ যৌবনেরে চঞ্চলতা দিয়ে ভরিয়ে দিয়ে গেছে। 'গঙ্গা যেন হেসে দুলায় ধূর্জটির জটা (শিবের জট)'। এই নিপুণ উপমায় কবি প্রৌঢ় বয়সের সেই সমাহারপূর্ণ প্রেমের বিবরণ দিয়েছেন। 'প্রেমবৈচিত্র্য' উপবিভাগে যে গানগুলি আছে তা কবির ১৭-৭৮ বছর বয়সের রচনা। তাই বিভিন্ন বয়সের প্রেমভাবনার বিচিত্র সমাহার ঘটেছে গানগুলিতে। যেমন আছে বসন্ত ঋতুর মিলনের আভাস, তেমনি আছে বর্ষার বিরহ ব্যকুল বেদনার স্মৃতি। বসন্ত ঋতুর যে রঙিন উচ্ছ্বাস মিলনাকুলতা রয়েছে তেমনি রয়েছে বেদনার আভাস। যেমন 'এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে' গানে বসন্তের ঝরা মুকুল সংগ্রহ করে কবি তাঁর প্রিয়জনের হাতে তুলে দিতে চেয়েছেন। কারণ-

যখন যাব চলে ওরা ফুটবে তোমার কোলে
তোমার মালা গাঁথার আঙুলগুলি মধুর বেদনভরে
যেন আমায় স্মরণ করে ॥

এভাবে দেখা যায় প্রেমপর্যায়ের গানে 'প্রেমবৈচিত্র্য উপবিভাগে বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন সময়ের অনুভূতির মিশ্রণ। আমরা এর পরবর্তী আলোচনায় কালানুক্রমিক তালিকা হতে প্রেমের গানের 'মিলন ও বিরহের' রূপটি আরও স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করব।

প্রেমপর্যায়ের গানের কালানুক্রমিক তালিকার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তিনটি পর্বে ভাগ করেছি গানগুলিকে। যেখানে বয়সক্রমে গানগুলির একটি পরিস্কার প্রেমচেতনার আভাস পাব। বোঝার সুবিধার্থে প্রতি পর্ব থেকে কিছু গানের ভাব বিশ্লেষণের চেষ্টা করব। যা পাঠকের কাছে কবির 'মিলন ও বিরহ' অনুভূতির রূপটি আরও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানবীয় ভালোবাসার আবেগঘন উত্তাপে রচনা করেছিলেন গীতিনাট্য *মায়ারখেলা* (১২৯৫)। এই গীতিনাট্য দিয়ে কবির প্রেমানুভূতির যাত্রার শুরু হয়। সমাপ্তি ঘটে ভালোবাসার বেদনা বিধুর বিরহের তীর্থে *শ্যামা* নৃত্যনাট্য দিয়ে (১৩৪৪)। কালানুক্রমিক তালিকা অনুসারে প্রেমপর্যায়ের গানগুলির প্রথম পর্বটি একান্তই রোমান্টিক ও আনন্দ বিষাদ মগ্নতায় আচ্ছন্ন। এই পর্বে, সতেরো বছর বয়স থেকে কবির প্রেমের গানের রচনা শুরু হয়। তবে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, এর আগেও কবি প্রেমের গান রচনা করেছেন। যেমন- *ভানুসিংহের পদাবলী* তাঁর কিশোর বয়সের রচনা। 'প্রেম ও প্রকৃতি' পর্যায়ে ষোল বছর বয়সে রচিত গান-

সাধের কাননে যে মোর রোপণ করিয়াছিনু
একটি লতিকা, সখী, অতিশয় যতনে।...
... প্রেমের সে আলিঙ্গনে স্নিগ্ধ রেখেছিল তারে
কোমল পল্লবদলে নিবারিয়া আতপে...

কালানুক্রমিক তালিকা অনুসারে প্রেমের গানের প্রথম পর্বের তালিকা -

১ম পর্ব

১৬(১৮৭৭) - ৩৬ (১৮৯৭)

কালানুক্রমিক নং	কালানুক্রমিক সূচি	বয়স	সাল	*গীতবিতানে* গানের সিরিয়াল সংখ্যা
০১	*দেখে যা, দেখে যা, দেখে যা লো তোরা*	১৭	১৮৭৮	৩৭৭
০২	*আয় তবে সহচরী, হাতে হাতে ধরি ধরি*	১৮	১৮৭৯	৩৬৪
০৩	*তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা*	১৯	১৮৮০	১২১
০৪	*মরণ রে তুঁহুঁ মম শ্যামসমান*	২০	১৮৮১	১৮১

কালানুক্রমিক নং	কালানুক্রমিক সূচি	বয়স	সাল	গীতবিতানে গানের সিরিয়াল সংখ্যা
০৫	কী হল আমার! বুঝি বা সখী	২০	১৮৮১	৩৪৯
০৬	আজ তোমারে দেখতে এলেম	২০	১৮৮১	৩৬৫
০৭	সমুখেতে বহিছে তটিনী	২১	১৮৮২	৩৭০
০৮	বল্, গোলাপ, মোরে বল্	২১	১৮৮২	৩৯৪
০৯	আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল	২২	১৮৮৩	১৯২
১০	তারে দেখাতে পারি নে কেন প্রাণ খুলে গো	২২	১৮৮৩	৩১৪
১১	বুঝি বেলা বহে যায়	২২	১৮৮৩	৩৭১
১২	সখী, সে গেল কোথায়	২২	১৮৮৩	৩৮২
১৩	ওকে চুরি ক'রে চায়	২২	১৮৮৩	৩৯১
১৪	মরি লো মরি, আমার বাঁশিতে ডেকেছে কে	২৩	১৮৮৪	৫৯
১৫	সখী, ওই বুঝি বাঁশি বাজে	২৩	১৮৮৪	১৪৪
১৬	মনে রয়ে গেল মনের কথা	২৩	১৮৮৪	১৯৩
১৭	বাঁশরি বাজাতে চাহি	২৩	১৮৮৪	৩০৫
১৮	বনে এমন ফুল ফুটেছে	২৩	১৮৮৪	৩৭২
১৯	কেহ কারো মন বুঝে না	২৩	১৮৮৪	৩৯২
২০	গেল গো- ফিরিল না	২৩	১৮৮৪	৩৯৩
২১	বলো দেখি, সখী লো	২৪	১৮৮৫	৩৭৬
২২	যে ফুল ঝরে সেই তো ঝরে	২৪	১৮৮৫	৩৮৭
২৩	হল না লো, হল না, সই	২৪	১৮৮৫	৩৯০
২৪	ধরা দিয়েছি গো আমি আকাশের পাখি	২৫	১৮৮৬	৫৪
২৫	ওগো শোনো কে বাজায়	২৫	১৮৮৬	৫৬
২৬	ওগো কে যায় বাঁশরি বাজায়ে	২৫	১৮৮৬	৩০০
২৭	হেলাফেলা সারা বেলা	২৫	১৮৮৬	৩০১
২৮	ওগো এত প্রেম- আশা প্রাণের তিয়াষা	২৫	১৮৮৬	৩০২
২৯	আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন	২৫	১৮৮৬	৩০৩

কালানুক্রমিক নং	কালানুক্রমিক সূচি	বয়স	সাল	গীতবিতানে গানের সিরিয়াল সংখ্যা
৩০	*কখন যে বসন্ত গেল, এবার হল না গান*	২৫	১৮৮৬	৩০৪
৩১	*আজ আঁখি জুড়ালো হেরিয়ে*	২৫	১৮৮৬	৩৫০
৩২	*তুমি কোন্ কাননের ফুল*	২৫	১৮৮৬	৩৬৩
৩৩	*বিদায় করেছ যারে নয়নজলে*	২৫	১৮৮৬	৩৮৩
৩৪	*তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে*	২৬	১৮৮৭	১৫১
৩৫	*কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া*	২৬	১৮৮৭	১৮৮
৩৬	*আমার পরান যাহা চায় তুমি তাই*	২৭	১৮৮৮	১৪২
৩৭	*ভুল করেছিনু, ভুল ভেঙেছে*	২৭	১৮৮৮	২০৩
৩৮	*ওগো সখী, দেখি দেখি*	২৭	১৮৮৮	৩১১
৩৯	*সখী, বহে গেল বেলা, শুধু হাসিখেলা*	২৭	১৮৮৮	৩১২
৪০	*ওলো রেখে দে সখী, রেখে দে*	২৭	১৮৮৮	৩১৩
৪১	*এ তো খেলা নয়, খেলা নয়*	২৭	১৮৮৮	৩১৫
৪২	*দিবস রজনী আমি যেন কার*	২৭	১৮৮৮	৩১৬
৪৩	*অলি বার বার ফিরে যায়*	২৭	১৮৮৮	৩১৭
৪৪	*সকল হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছি যারে*	২৭	১৮৮৮	৩৫১
৪৫	*তারে কেমনে ধরিবে, সখী*	২৭	১৮৮৮	৩৫২
৪৬	*ওই মধুর মুখ জাগে মনে*	২৭	১৮৮৮	৩৫৩
৪৭	*সুখে আছি, সুখে আছি সখা আপন মনে*	২৭	১৮৮৮	৩৫৪
৪৮	*ভালোবেসে যদি সুখ নাই*	২৭	১৮৮৮	৩৫৫
৪৯	*সখা, আপন মন নিয়ে কাঁদিয়ে মরি*	২৭	১৮৮৮	৩৫৬
৫০	*প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে*	২৭	১৮৮৮	৩৫৭
৫১	*এসেছি গো এসেছি মন দিতে এসেছি*	২৭	১৮৮৮	৩৫৮
৫২	*যেয়ো না, যেয়ো না ফিরে*	২৭	১৮৮৮	৩৫৯
৫৩	*কাছে আছে দেখিতে না পাও*	২৭	১৮৮৮	৩৬০
৫৪	*জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত*	২৭	১৮৮৮	৩৬১

কালানুক্রমিক নং	কালানুক্রমিক সূচি	বয়স	সাল	গীতবিতানে গানের সিরিয়াল সংখ্যা
৫৫	পথহারা তুমি পথিক যেন গো	২৭	১৮৮৮	৩৬২
৫৬	নিমেষের তরে শরমে বাঁধিল	২৭	১৮৮৮	৩৭৮
৫৭	আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল	২৭	১৮৮৮	৩৭৯
৫৮	ওকে বল্ সখী, বল্-	২৭	১৮৮৮	৩৮০
৫৯	কে ডাকে আমি কভু ফিরে নাহি চাই	২৭	১৮৮৮	৩৮১
৬০	না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁখিজলে	২৭	১৮৮৮	৩৮৪
৬১	বাজিবে, সখী, বাঁশি বাজিবে-	২৮	১৮৮৯	১১৫
৬২	আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি	২৮	১৮৮৯	১৪৩
৬৩	এমন দিনে তারে বলা যায়	২৮	১৮৮৯	২৪৮
৬৪	বঁধু, তোমায় করব রাজা তরুতলে	২৮	১৮৮৯	৩৬৮
৬৫	এরা পর কে আপন করে, আপনারে পর	২৮	১৮৮৯	৩৬৯
৬৬	যদি আসে তবে কেন যেতে চায়	২৮	১৮৮৯	৩৪২
৬৭	আমার পরান লয়ে কী খেলা	৩১	১৮৯২	৩১
৬৮	আমার মন মানে না - দিনরজনী	৩১	১৮৯২	৫৮
৬৯	কেন নয়ন আপনি ভেসে যায় জলে	৩১	১৮৯২	২৪৬
৭০	বড়ো বেদনার মতো বেজেছে তুমি হে	৩২	১৮৯৩	৫৭
৭১	হৃদয়ের এ কূল, ও কূল	৩২	১৮৯৩	৮২
৭২	তবে শেষ করে দাও শেষ গান	৩২	১৮৯৩	১৪৯
৭৩	সখী আমারি দুয়ারে কেন আসিল	৩২	১৮৯৩	১৫০
৭৪	আজি যে রজনী যায়	৩২	১৮৯৩	২৪৭
৭৫	মনে যে আশা লয়ে এসেছি হল না	৩২	১৮৯৩	৩৬৬
৭৬	এখনো তারে চোখে দেখি নি	৩২	১৮৯৩	৩৬৭
৭৭	সাজাব তোমারে হে ফুল দিয়ে দিয়ে	৩২	১৮৯৩	৩৮৮
৭৮	মন জানে মনোমোহন আইল	৩২	১৮৯৩	৩৮৯
৭৯	বাজিল কাহার বীণা	৩৩	১৮৯৪	২৯

কালানুক্রমিক নং	কালানুক্রমিক সূচি	বয়স	সাল	গীতবিতানে গানের সিরিয়াল সংখ্যা
৮০	সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি	৩৩	১৮৯৪	৩২
৮১	আমারে করো তোমার বীণা	৩৩	১৮৯৪	৩৩
৮২	কত কথা তারে ছিল বলিতে	৩৩	১৮৯৪	৩৭
৮৩	এসো এসো ফিরে এসো	৩৩	১৮৯৪	২৫২
৮৪	চিত্ত পিপাসিত রে	৩৪	১৮৯৫	০১
৮৫	কী রাগিনী বাজালে হৃদয়ে	৩৪	১৮৯৫	৫৫
৮৬	তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম	৩৪	১৮৯৫	৬২
৮৭	তোমার গোপন কথাটি	৩৪	১৮৯৫	৬৩
৮৮	ওলো সই, ওলো সই	৩৪	১৮৯৫	৮১
৮৯	আমি চিনি গো চিনি তোমারে	৩৪	১৮৯৫	৮৬
৯০	আহা, জাগি পোহালো বিভাবরী	৩৪	১৮৯৫	১৩৯
৯১	সে আসে ধীরে	৩৪	১৮৯৫	১৪০
৯২	পুষ্পবনে পুষ্প নাহি, আছে অন্তরে	৩৪	১৮৯৫	১৪১
৯৩	তুমি যেয়ো না এখনি	৩৪	১৮৯৫	১৫২
৯৪	আকুল কেশে আসে	৩৪	১৮৯৫	১৫৩
৯৫	কে দিল আবার আঘাত	৩৪	১৮৯৫	১৫৪
৯৬	ওহে সুন্দর, মম গৃহে আজি	৩৪	১৮৯৫	১৮৭
৯৭	কে ওঠে ডাকি মম বক্ষোনীড়ে	৩৪	১৮৯৫	২৯৯
৯৮	ভালোবেসে, সখী, নিভৃতে যতনে	৩৬	১৮৯৭	৩৪
৯৯	ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ	৩৬	১৮৯৭	৩৫
১০০	তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা	৩৬	১৮৯৭	৩৬
১০১	আমি চাহিতে এসেছি শুধু	৩৬	১৮৯৭	৫৩
১০২	সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে	৩৬	১৮৯৭	৬১
১০৩	যদি বারণ কর তবে গাহিব না	৩৬	১৮৯৭	১২২
১০৪	কেন বাজাও কাঁকন কনকন	৩৬	১৮৯৭	১২৩

কালানুক্রমিক নং	কালানুক্রমিক সূচি	বয়স	সাল	*গীতবিতানে* গানের সিরিয়াল সংখ্যা
১০৫	*কেন যামিনী না যেতে জাগালে না*	৩৬	১৮৯৭	১২৪
১০৬	*মম যৌবননিকুঞ্জে গাহে পাখি*	৩৬	১৮৯৭	১৩৮
১০৭	*কেন ধরে রাখা, ও যে যাবে চলে*	৩৬	১৮৯৭	২৪১

প্রথম পর্বের গানের তালিকাটি খেয়াল করলে পাই, শুরুর দিকের গানগুলি কবির একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ। তাঁর রচনায় কাউকে মনে ভালোলাগার যে আনন্দ, আবার না পাওয়ার যে বেদনা, তা ফুটে ওঠে। যেমন ১৭ বছর বয়সে রচিত গান-

দেখে যা, দেখে যা, দেখে যা লো তোরা সাধের কাননে মোর
আমার সাধের কুসুম উঠেছে ফুটিয়া, মলয় বহিছে সুরভি লুটিয়া রে-
হেথায় জোছনা ফুটে, তটিনী ছুটে, প্রমোদে কানন ভোর ॥
আয় আয় সখী, আয় লো হেথা, দুজনে কহিব মনের কথা।
তুলিব কুসুম দুজনে মিলি রে-
সুখে গাঁথিব মালা, গণিব তারা, করিব রজনী ভোর ॥
এ কাননে বসি গাহিব গান, সুখের স্বপনে কাটাব প্রাণ,
খেলিব দুজনে মনের খেলা রে-
প্রাণে রহিবে মিশি দিবসনিশি আধো-আধো ঘুমঘোর ॥

গানটিতে কবির একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি, তাঁর মনের মানুষের জন্য ফুটে উঠেছে। যেখানে কবি দুজনে একসাথে মনের কথা বলবে, সুখের মালা গাঁথবে, গান করবে, সুখের স্বপনে প্রাণ কাটাবে। এখানে, কবির ব্যক্তিচিত্তে আনন্দভাবনার ভাবটি ফুটে উঠেছে।

প্রেমপর্যায়ের প্রথম পর্বের কালানুক্রমিক তালিকা অনুসারে গানগুলি বেশির ভাগই না পাওয়ার বেদনার সুর পাওয়া যায়। কবির মনে অকারণ বিরহ গুঞ্জরিত হয় গানে। প্রত্যেকটি গানে এতটাই পরিণত অনুভূতি, যা অবাক করবে পাঠককে। কুড়ি বছর বয়সে রচনা করেন 'মরণ রে তুঁহুঁ মম শ্যামসমান' যেখানে কবি মৃত্যুর কথা বলেছেন। কবির মনে বসন্ত এসে চলে যায় যেমন, তেমনি মনের মানুষ বসন্তের বাতাসের মত ছুঁয়ে চলে যায়, কিন্তু কবি তার দেখা পায় না। এই যে অকারণ মনে আকুলতা না পাওয়ার, কাউকে খোঁজ করবার চঞ্চল আঁখি, তাইতো কবি রচনা করেন 'আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে'। কবির মনের বেদনা মনেই রয়ে যায়। কাউকে মনের কথা বলতে না পারার বেদনা কবি প্রকাশ করেছেন-

মনে রয়ে গেল মনের কথা-

শুধু চোখের জল, প্রাণের ব্যথা।

মনে করি দুটি কথা বলে যাই, কেন মুখের পানে চেয়ে চলে যাই।

সে যদি চাহে মরি যে তাহে, কেন মুদে আসে আঁখির পাতা ॥

ম্লানমুখে, সখী, সে যে চলে যায়-

ও তারে ফিরায়ে ডেকে নিয়ে আয়

বুঝিল না সে যে কেঁদে গেল-ধুলায় লুটাইল হৃদয়লতা ॥

গানটি কবির তেইশ বছর বয়সে রচিত। সব সময় মনের মানুষ সামনে থাকলে অব্যক্ত কথা বলা যায় না, কবিও সেটা পারেন নি। প্রাণে ব্যথা ও চোখের জল দিয়ে মনের কথা আড়াল করেন। আবার, প্রেমে একে অপরের মন বোঝা বড় দায়। দু'জনে মনের বোঝাপড়া হলেই তো প্রেমের মিলন ঘটে। কিন্তু কবির ক্ষেত্রে প্রথম পর্বের গানে বেদনাটাই যেন মুখ্য। তাইতো কবি বলেন-

কেহ কারো মন বুঝে না, কাছে এসে সরে যায়।

সোহাগের হাসিটি কেন, চোখের জলে মরে যায় ...

মানুষের মন মাঝে মাঝে আলস্যে পড়ে যায়। অন্যান্য দিনের ব্যস্ততম জীবনের মত কর্মময় দিন কাটাতে চায় না, মনে পড়ে যায় পুরোনো কথা বা স্মৃতি। তেমনি কবিরও শরতের কোন এক দিনে হেলাফেলা সারাবেলায় কারও মুখখানি মনে পড়ে যায়। চোখের কাছে অজানা হাসি ঘুরে বেড়ায় যা চোখের কোনে দুটি ফোঁটা নয়নসলিল হিসেবে থেকে যায়। কবি যে কারে চান, বুঝতে পারেন না শুধু গান গেঁথে যান। আর তাইতো পঁচিশ বছর বয়সে কবি গেয়ে ওঠেন-

... হেলাফেলা সারা বেলা এ কি খেলা আপন-সনে

এই বাতাসে ফুলের বাসে মুখখানি কার পড়ে মনে ॥.....

সারা দিন গাঁথি গান কারে চাহে গাহে প্রাণ

তরুতলের ছায়ার মতন বসে আছি ফুলবনে ॥

কবির মনে অকারণ বিরহ গুঞ্জরিত হয়। কেবলি মধুর আবেশে অলস স্বপনে কবি আত্মহারা। দুরভিসারী কবিকে যেন পুরাতন প্রেম বিস্তৃত করতে না পারে তারই সজল মিনতি পাই আমরা ছাব্বিশ বছর বয়সে রচিত এই প্রেমের গানে-

তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে।

যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় নবপ্রেমজালে।

যদি থাকি কাছাকাছি,

দেখিতে না পাও ছায়ার মতন আছি না আছি-

তবু মনে রেখো ॥ ...

প্রথম বয়সের গান গুলিতে পাই প্রেমিকার অপেক্ষা। যাকে কবি দিনের জাগরণে দেখতে পান না, শুধু স্বপনের আশায় থাকেন যদি একবার ধরা দেয়। সেই আশায় কবি বলেন-

দিবস রজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি

তাই চমকিত মন, চকিত শ্রবণ, তৃষিত আকুল আঁখি ॥ ...

কবি সাতাশ বছর বয়সে গানটি রচনা করেন। গানের শুরুতে যেমন অপেক্ষা, তেমনি শেষে পাওয়া যায় কবির অবচেতন মনের মগ্নতা। তিনি ভাবেন যাকে এত ভালোবাসি, এত চাই, সে যে তাঁর কাছে নাই তা তিনি অনুভব করেন না। এমন ভাবনায় তিনি রচনা করেন

... এত ভালোবাসি, এত যারে চাই, মনে হয় না তো সে যে কাছে নাই-

যেন এ বাসনা ব্যাকুল আবেগে তাহারে আনিবে ডাকি ॥

পরবর্তী বছর চৌত্রিশ বছর বয়সে কবির প্রেমে বিরহ এমন যে, পূর্ণিমা নিশীথে নিবিড় একাকিত্বে কবির মনে জেগে ওঠে বিগত প্রেমের ছবি। পূর্ণিমা নিশীথিনী-সম রূপে নীরবে হৃদয়ে থাকবে কবির ভালোবাসা। হৃদয়ে থাকবার বা যতনে রাখবার যে সুখবোধ তা তিনি প্রকাশ করেন এভাবে-

মম জীবন যৌবন, মম অখিল ভুবন

তুমি ভরিবে গৌরবে নিশীথিনী-সম ॥...

কবি মনে করেন দুঃখবেদনা ভরা কবির যে সফল স্বপন, তাও ভালোবাসার মানুষ সৌরভে ভরিয়ে দিবে। তাই গানের শেষে বলেন-

মম দুঃখ-বেদন মম সফল-স্বপন

তুমি ভরিবে সৌরভে, নিশীথিনী-সম ॥...

কবির মনে ব্যক্তিপ্রেম ব্যতীত এক সৌন্দর্যময়ী সত্ত্বাকে পাওয়া যায়। যে কখনো বিরহিনী, মৃত্যুবিচ্ছিন্না, অসীমে স্থানান্তরিতা, স্মৃতিলোকবাসিনী, কখনো বিদেশিনী, আবার কখনও জীবন দেবতারূপেও কবির কল্পনায় পাওয়া যায়। বিদেশিনী রূপে চৌত্রিশ বছর বয়সে লেখেন 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী'। এই গানটির রচনাকালীন সময়ে কবির মনোভাব যেন এমন- সুরের মন্ত্রগুঞ্জরণে বিদেশিনীর এক অপরূপ মূর্তি জেগে ওঠে কবির মনে। তিনি মনে করেন তাঁর এই জগতের মধ্যে কোন বিদেশিনী আনাগোনা করে, যেন কোনো রহস্যসিন্ধুর পরপারে ঘাটের উপরে তার বাড়ি। তাকেই শারদপ্রাতে, মাধবীরাত্রিতে ক্ষণে ক্ষণে তিনি দেখতে পান। হৃদয়ের মাঝখানেও মাঝে মাঝে তার আভাস কবি পান। যেন আকাশে কান পাতিয়া তার কণ্ঠস্বর কখনোবা তিনি শুনেছেন।

কালানুক্রমিক প্রথম পর্বের শেষে ছত্রিশ বছর বয়সে রচিত গানগুলিতে প্রত্যক্ষ বেদনার রূপটি কিছুটা বদলে যায়। এসময় কবি ভালোবাসার মানুষটির মনে নিজের স্থান করে নিতে চান। তাঁর নামটি মনের মন্দিরে লিখে রাখতে বলেন। চরণমঞ্জীরে, প্রাসাদপ্রাঙ্গনে, কনককঙ্কণে, অলকবন্ধনে, ললাটচন্দনে, অঙ্গসৌরভে শেষে অতুল

গৌরবে বিভিন্ন উপমায় তিনি প্রেয়সীকে তাঁর উপস্থিতি ধরে রাখতে বলেন। তাইতো বলেছেন-

ভালোবেসে, সখী, নিভৃতে যতনে
আমার নামটি লিখো-তোমার
মনের মন্দিরে ॥
আমার পরানে যে গান বাজিছে
তাহার তালটি শিখো- তোমার
চরণমঞ্জীরে ॥...

একই বয়সে আরেকটি গানে কবি প্রেয়সীকে-শূন্যগগনবিহারী, অসীমগগনবিহারী, সন্ধ্যাস্বপনবিহারী, বিজনজীবনবিহারী, মুগ্ধনয়নবিহারী ও জীবনমরণবিহারী উপমায় উপমিত করেছেন। বলেছেন-

তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, তুমি আমার সাধের সাধনা,
মম শূন্যগগনবিহারী
আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে,
তোমারে করেছি রচনা-
তুমি আমারি, তুমি আমারি
মম অসীমগগনবিহারী ॥...

কালানুক্রমিক সূচির দ্বিতীয় পর্বের গানের তালিকা-

২য় পর্ব

৩৭(১৮৯৮) - ৫৭ (১৯১৮)

কালানুক্রমিক নং	কালানুক্রমিক সূচি	বয়স	সাল	*গীতবিতানে* গানের সিরিয়াল সংখ্যা
১০৮	*হে নিরুপমা, গানে যদি লাগে বিহ্বল তান*	৩৯	১৯০০	৩৯
১০৯	*নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ*	৩৯	১৯০০	১২৫
১১০	*অলকে কুসুমে না দিয়ো*	৪০	১৯০১	১২৬
১১১	*কেন সারা দিন ধীরে ধীরে*	৪০	১৯০১	২৯৬
১১২	*এবার, সখী, সোনার মৃগ দেয়*	৪২	১৯০৩	৩৪৮
১১৩	*কী সুর বাজে আমার প্রাণে*	৪৩	১৯০৪	২৯৭
১১৪	*না বলে যেয়ো না চলে মিনতি করি*	৪৮	১৯০৯	৮৩

কালানুক্রমিক নং	কালানুক্রমিক সূচি	বয়স	সাল	গীতবিতানে গানের সিরিয়াল সংখ্যা
১১৫	আর নাই রে বেলা, নামল ছায়া ধরণীতে	৪৮	১৯০৯	৮৪
১১৬	কে বলেছে তোমায়, বঁধু	৪৮	১৯০৯	১১৬
১১৭	ও যে মানে না মানা	৪৮	১৯০৯	১১৯
১১৮	মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে	৪৮	১৯০৯	১২০
১১৯	ওকে ধরিলে তো ধরা দিবে না-	৪৮	১৯০৯	২৪০
১২০	নয়ন মেলে দেখি আমায়	৪৮	১৯০৯	৩৮৫
১২১	হাসিরে কি লুকাবি লাজে	৪৮	১৯০৯	৩৮৬
১২২	যা ছিল কালো-ধলো	৪৯	১৯১০	৮৭
১২৩	আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা	৪৯	১৯১০	৮৮
১২৪	আমার সকল নিয়ে বসে আছি	৪৯	১৯১০	৮৯
১২৫	আমি রূপে তোমায় ভোলাব না	৪৯	১৯১০	৯০
১২৬	খোলো খোলো দ্বার	৪৯	১৯১০	১১৪
১২৭	তোরা যে যা বলিস ভাই	৪৯	১৯১০	১৮৪
১২৮	বিরহ মধুর হল আজি মধুরাতে	৪৯	১৯১০	২৬২
১২৯	সে যে পাশে এসে বসেছিল	৪৯	১৯১০	২৬৭
১৩০	কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে	৪৯	১৯১০	৩২৭
১৩১	আমি কেবল তোমার দাসী	৪৯	১৯১০	৩৭৩
১৩২	আমি তোমার প্রেমে হব সবার কলঙ্কভাগী	৫০	১৯১১	৯১
১৩৩	কবে তুমি আসবে ব'লে রইব না বসে	৫০	১৯১১	২৯০
১৩৪	ঘরেতে ভ্রমর এল গুন্‌গুনিয়ে	৫০	১৯১১	৩২৬
১৩৫	তুমি একটু কেবল বসতে দিয়ো কাছে	৫১	১৯১২	৯৫
১৩৬	ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো	৫১	১৯১২	৩২৩
১৩৭	যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা	৫৩	১৯১৪	৪৬
১৩৮	আমি যে আর সইতে পারি নে	৫৩	১৯১৪	৪৭
১৩৯	বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা	৫৩	১৯১৪	৮৫

কালানুক্রমিক নং	কালানুক্রমিক সূচি	বয়স	সাল	*গীতবিতানে* গানের সিরিয়াল সংখ্যা
১৪০	*তোমার রঙিন পাতায় লিখব*	৫৩	১৯১৪	১৩১
১৪১	*প্রাণ চায় চক্ষু না চায়*	৫৩	১৯১৪	৩৪৫
১৪২	*আজ যেমন ক'রে গাইছে আকাশ*	৫৩	১৯১৪	৩৭৪
১৪৩	*কাল রাতের বেলা গান এল মোর মনে*	৫৪	১৯১৫	০৯
১৪৪	*এবার উজাড় করে লও হে*	৫৪	১৯১৫	৬০
১৪৫	*আমার নিশীথরাতের বাদল ধারা*	৫৪	১৯১৫	৬৮
১৪৬	*আমি যাব না গো অমনি চলে*	৫৪	১৯১৫	১১৩
১৪৭	*আমার একটি কথা বাঁশি জানে*	৫৪	১৯১৫	২৯৪
১৪৮	*তুই ফেলে এসেছিস কারে মন*	৫৪	১৯১৫	৩০৭
১৪৯	*ওরে আমার হৃদয় আমার*	৫৫	১৯১৬	০৮
১৫০	*একদা তুমি, প্রিয়ে, আমার এ তরুমূলে*	৫৫	১৯১৬	২৯৩
১৫১	*ও দেখা দিয়ে যে চলে গেল*	৫৫	১৯১৬	২৯৫
১৫২	*কোন্ অযাচিত আশার আলো*	৫৫	১৯১৬	৩৪১
১৫৩	*পাখি আমার নীড়ের পাখি*	৫৭	১৯১৮	২২
১৫৪	*সবার সাথে চলতেছিল অজানা*	৫৭	১৯১৮	৩০
১৫৫	*অনেক পাওয়ার মাঝে মাঝে*	৫৭	১৯১৮	১০০
১৫৬	*সে যে বাহির হল আমি জানি*	৫৭	১৯১৮	২৮৯
১৫৭	*জাগরণে যার বিভাবরী*	৫৭	১৯১৮	২৯১

দ্বিতীয় পর্বের শুরু দিকে গানে আমরা কবির বিষাদময়তাই পাই। ঊনচল্লিশ বছর বয়সে কবির রচনা-

হে নিরুপমা

গানে যদি লাগে বিহবল তান করিয়ো ক্ষমা।

কবি প্রেয়সীর কাছে ক্ষমা চাইছেন নিরুপমা উপাধিতে। এখানে কাল্পনিক একটা রুপ কবি তাঁর গানে কল্পনা করেন। কল্পনাময়ী কখনো পাশে থাকে আবার কখনো কবি তাঁর কছে ফিরে যেতে চান। এই পর্বে রূপাশ্রিত প্রেমভাবনা অতীন্দ্রিয়ের স্পর্শে অনুভবভেদ্য হয়ে ওঠে ধীরে ধীরে। কবির প্রেমভাবনায় প্রেয়সীকে কাছে না পেয়েও মনের কথা বলার যে এক আপন কাল্পনিক শক্তি আছে তা বারবার এই পর্বের গানে আমরা খুঁজে পাবো। কারণ কবির মনেই যে কবির প্রিয়তমের অবস্থান। তাইতো আটচল্লিশ বছর বয়সে কবি বলেছেন-

... আমি সুখে দুঃখে পারব, বন্ধু, চিরানন্দে রইতে-

তোমার সঙ্গে বিনা কথায় মনের কথা কইতে ॥

রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধ ও জীবনী থেকে দেখা যায় তিনি জীবনে যত ঘাত-প্রতিঘাত পেয়েছেন ততই নিজেকে গড়েছেন। তিনি যেমন চলার পথে ভালোলাগার মানুষ পেয়েছেন, যা হয়ত সফল প্রেমের গল্প হয়ে ওঠেনি, তেমনি তিনিও অনেকের পছন্দের তালিকায় ছিলেন। যারা রবীন্দ্রনাথকে অপার ভালোবাসতেন। পাওয়া না পাওয়ার এই দুঃখ বোধই তাঁর লেখনীর শক্তি হয়ে দাঁড়ায়। গানের সুরে কবি প্রেমের বাঁধাগুলোকে খুলতে চান। শুধু কাছে বসে থাকার, শুধু প্রিয়সঙ্গসুখের নির্মল আনন্দ অনুভবে তৃপ্ত কবি প্রিয়জনের সঙ্গে প্রাণের খেলার লীলারসে মগ্ন। ঊনপঞ্চাশ বছর বয়সে কবি লিখেছেন-

আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা, প্রিয় আমার, ওগো প্রিয়-

বড়ো উতলা আজ পরান আমার, খেলাতে হার মানবে কি ও ॥

কেবল তুমিই কি গো এমনি ভাবে রাঙিয়ে মোরে পালিয়ে যাবে।

তুমি সাধ ক'রে, নাথ, ধরা দিয়ে আমারও রঙ বক্ষে নিও -

এই হৃৎকমলের রাঙা রেণু রাঙাবে ওই উত্তরীয় ॥

এই পর্বের গানে প্রেমের ক্ষণচাপল্য ও অস্থিরতা গানের অবয়বে পাওয়া যায়। এ সময় কবি বিরহবোধকেও উপভোগ করতে শুরু করেন। বেদনার যে রাগিনী অন্তরে বাজে তাও মধুর হয়ে ওঠে কবির চিত্তে। তাই তো এই একই বয়সে কবি বলেছেন-

বিরহ মধুর হল আজি মধুরাতে

গভীর রাগিনী উঠে বাজি বেদনাতে ॥...

বিরহবোধ হতে কবির ধীরে ধীরে একটি আত্মবিশ্বাসের জায়গা তৈরী হয়। দুঃখের মধ্যেও সুখকে তিনি খুঁজে পান। প্রেমের অপেক্ষায় রূপটা কিছুটা বদলে যায়। পূর্বে কবি অপেক্ষার প্রহরে দিন রাত্রি পার করতে চেয়েছেন, নানান উপমায় বিরহ প্রকাশ করেছেন। পঞ্চাশ বছর বয়সে কবি বলেছেন-

কবে তুমি আসবে ব'লে রইব না বসে, আমি চলব বাহিরে।

শুকনো ফুলের পাতাগুলি পড়তেছে খসে, আর সময় নাহি রে ॥ ...

তাইতো প্রেমকে কবি জীবনের নিয়ত প্রবাহে অনুভব করতে চান, তাই কবে সে আসবে বলে আর প্রতীক্ষারত নন। পঞ্চাশ বছরের পরে গানগুলিতে কবি এই পর্বে ভালোবাসার অশেষ বৈচিত্র্যের সন্ধানী। জীবনরসিক কবি প্রেমের রূপ ও রাগের নিত্যনবনিতনায়, প্রাণপ্রাচুর্য্যে স্থির। কবি নিজে বলেছেন-

"প্রথম বয়সে আমি হৃদয়ভাব প্রকাশ করাবার চেষ্টা করেছি গানে, আশা করি সেটা কাটিয়ে উঠেছি পরে। পরিণত বয়সের গান ভাব বাৎলাবার জন্য নয়, রূপ দেবার জন্য। তৎসংশ্লিষ্ট কাব্যগুলিও অধিকাংশই রূপের বাহন।"[২]

প্রথম পর্বের প্রেমের গানে কবির মনের যে ব্যথা স্পষ্ট ছিল তা এখন অস্পষ্ট। কে যে তাঁকে কাঁদায় তা তিনি

জানেন না। এই বেদনার ধন সে ভুবন ভরে দেখতে পান, কিন্তু জীবন ভরে তাঁরই খোঁজ করে যান। সবাই যারে সুখ ব'লে সেই সুখকে তিনি বুঝতে চান, আর তাইতো বার বার পরখ করে বুঝতে পারেন সকলের চাওয়া আর তাঁর চাওয়া ভিন্ন। তিপ্পান্ন বছর বয়সে অনুভব-

যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা তোমায় জানাতাম।
কে যে আমায় কাঁদায় আমি কী জানি তার নাম ॥...
...সুখ যারে কয় সকল জনে বাজাই তারে ক্ষণে ক্ষণে-
গভীর সুরে 'চাই নে' বাজে অবিশ্রাম।

কবি ভালোবাসার শাশ্বত আশ্রয় খুঁজে পেয়েছেন চলার ছন্দে ছন্দে। মনোময়ী প্রিয়তমা ও প্রকৃতি তাঁর লেখনীতে হয়ে উঠেছে এক ও অভিন্ন।

প্রেমপর্যায়ের গানের কালানুক্রমিক সূচির শেষপর্বের গানের তালিকা-

৩য় পর্ব

৫৮(১৯১৯) - ৭৮ (১৯৩৯)

কালানুক্রমিক নং	কালানুক্রমিক সূচি	বয়স	সাল	*গীতবিতানে* গানের সিরিয়াল সংখ্যা
১৫৮	*আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে*	৫৮	১৯১৯	১৩২
১৫৯	*এই বুঝি মোর ভোরের তারা*	৫৮	১৯১৯	১৩৩
১৬০	*নাই নাই নাই যে বাকি*	৫৮	১৯১৯	২৯২
১৬১	*আমার মনের মাঝে যে গান বাজে*	৬০	১৯২১	০২
১৬২	*আকাশে আজ কোন্ চরণের আসা-যাওয়া*	৬০	১৯২১	১১
১৬৩	*সময় কারো নাই যে ওরা চলে দলে দলে*	৬০	১৯২১	১৭
১৬৪	*এই কথাটি মনে রেখো*	৬০	১৯২১	১৮
১৬৫	*পাছে সুর ভুলি এই ভয় হয়*	৬০	১৯২১	২৭
১৬৬	*আমার যদি বেলা যায় গো বয়ে*	৬০	১৯২১	৭৬
১৬৭	*আমার দোসর যে জন ওগো তারে*	৬০	১৯২১	১৩৪
১৬৮	*আমার মনের কোণের বাইরে*	৬০	১৯২১	১৫৮
১৬৯	*কোথা হতে শুনতে যেন পাই*	৬০	১৯২১	১৯৫
১৭০	*হায় গো, ব্যথায় কথা যায় ডুবে যায়*	৬০	১৯২১	২৪৩

কালানুক্রমিক নং	কালানুক্রমিক সূচি	বয়স	সাল	গীতবিতানে গানের সিরিয়াল সংখ্যা
১৭১	আমি এলেম তারি দ্বারে	৬০	১৯২১	২৮৬
১৭২	দীপ নিবে গেছে মম নিশীথসমীরে	৬০	১৯২১	২৮৭
১৭৩	আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিলো	৬১	১৯২২	১৩
১৭৪	আসা-যাওয়ার পথের ধারে	৬১	১৯২২	১৯
১৭৫	রাতে রাতে আলো আলোর শিখা রাখি জ্বেলে	৬১	১৯২২	৭২
১৭৬	এ কী সুধারস আনে	৬১	১৯২২	১১৮
১৭৭	ক্লান্ত বাঁশির শেষ রাগিণী	৬১	১৯২২	১৭৫
১৭৮	ফিরবে না তা জানি, তা জানি	৬১	১৯২২	২৫৯
১৭৯	একলা ব'সে একে একে অন্যমনে	৬১	১৯২২	২৮৪
১৮০	তার বিদায়বেলার মালাখানি	৬১	১৯২২	২৮৫
১৮১	গানগুলি মোর শৈবালেরই দল	৬২	১৯২৩	০৫
১৮২	তোমায় গান শোনাব	৬২	১৯২৩	০৬
১৮৩	তোমার শেষের গানের রেশ	৬২	১৯২৩	২৫
১৮৪	আমার শেষ রাগিণীর প্রথম ধুয়ো	৬২	১৯২৩	২৬
১৮৫	অনেক কথা বলেছিলেম	৬২	১৯২৩	৭৩
১৮৬	দিনশেষে রাঙা মুকুল জাগল চিতে	৬২	১৯২৩	১০১
১৮৭	না না) নাই বা এলে সময় নাই	৬২	১৯২৩	১৫৫
১৮৮	আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে	৬২	১৯২৩	১৭১
১৮৯	না রে না রে, ভয় করব না	৬২	১৯২৩	১৭৯
১৯০	ভরা থাক্, স্মৃতিসুধায় বিদায়ের পাত্রখানি	৬২	১৯২৩	২৩৯
১৯১	তোমার বীনায় গান ছিল আর	৬২	১৯২৩	২৪৪
১৯২	যুগে যুগে আমায় চেয়েছিল সে	৬২	১৯২৩	২৫৪
১৯৩	নাই যদি বা এলে তুমি	৬২	১৯২৩	২৬৫
১৯৪	আজি সাঁঝের যমুনায় গো	৬২	১৯২৩	২৮০
১৯৫	যে দিন সকল মুকুল গেল ঝরে	৬২	১৯২৩	৩০৮

কালানুক্রমিক নং	কালানুক্রমিক সূচি	বয়স	সাল	গীতবিতানে গানের সিরিয়াল সংখ্যা
১৯৬	*দ্বারে কেন দিলে নাড়া ওগো মালিনী*	৬২	১৯২৩	৩৪৬
১৯৭	*যায় নিয়ে যায় আমায়*	৬৩	১৯২৪	১৪
১৯৮	*আন্‌মনা আন্‌মনা*	৬৩	১৯২৪	৮০
১৯৯	*মোর স্বপন-তরীর কে তুই নেয়ে*	৬৩	১৯২৪	১২৮
২০০	*ভালোবাসি, ভালোবাসি*	৬৩	১৯২৪	১২৯
২০১	*তোর প্রাণের রস তো শুকিয়ে গেল ওরে*	৬৩	১৯২৪	১৮০
২০২	*ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার*	৬৩	১৯২৪	২৪২
২০৩	*ফিরে ফিরে ডাক্‌ দেখিরে*	৬৩	১৯২৪	২৬৩
২০৪	*আমার ভুবন তো আজ হলো কাঙাল*	৬৩	১৯২৪	২৭৪
২০৫	*যখন এসেছিলে অন্ধকারে*	৬৩	১৯২৪	২৭৫
২০৬	*যখন ভাঙ্গল মিলন-মেলা*	৬৩	১৯২৪	২৮২
২০৭	*আমার এ পথ তোমার পথের থেকে*	৬৩	১৯২৪	২৮৩
২০৮	*পথিক পরাণ, চল্‌ চল্‌ সে পথে তুই*	৬৩	১৯২৪	৩০৬
২০৯	*আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে*	৬৩	১৯২৪	৩১৯
২১০	*যে ছায়ারে ধরব বলে করেছিলেম পণ*	৬৪	১৯২৫	০৪
২১১	*গান আমার যায় ভেসে যায়*	৬৪	১৯২৫	১৬
২১২	*গানের ভেলায় বেলা অবেলায়*	৬৪	১৯২৫	২০
২১৩	*জয়যাত্রায় যাও গো, ওঠে জয়রথে তব*	৬৪	১৯২৫	৭৮
২১৪	*আছ আকাশ-পানে তুলে মাথা*	৬৪	১৯২৫	১০২
২১৫	*না, না গো না*	৬৪	১৯২৫	১০৩
২১৬	*চৈত্রপবনে মম চিত্তবনে*	৬৪	১৯২৫	১০৪
২১৭	*সে আমার গোপন কথা*	৬৪	১৯২৫	১১৭
২১৮	*না বলে যায় পাছে সে*	৬৪	১৯২৫	১৪৮
২১৯	*হে ক্ষণিকের অতিথি*	৬৪	১৯২৫	১৬২
২২০	*জানি, জানি হল যাবার আয়োজন*	৬৪	১৯২৫	১৭০

কালানুক্রমিক নং	কালানুক্রমিক সূচি	বয়স	সাল	গীতবিতানে গানের সিরিয়াল সংখ্যা
২২১	*কে বলে 'যাও যাও'*	৬৪	১৯২৫	১৭২
২২২	*কেন আমায় পাগল করে যাস*	৬৪	১৯২৫	১৭৩
২২৩	*যদি হল যাবার ক্ষণ*	৬৪	১৯২৫	১৭৪
২২৪	*ও আমার ধ্যানেরই ধন*	৬৪	১৯২৫	১৮৫
২২৫	*তার হাতে ছিল হাসির ফুলের হার*	৬৪	১৯২৫	২৪৫
২২৬	*বনে যদি ফুটল কুসুম*	৬৪	১৯২৫	২৫৫
২২৭	*আমার জ্বলে নি আলো*	৬৪	১৯২৫	২৫৭
২২৮	*কী ফুল ঝরিল বিপুল অন্ধকারে*	৬৪	১৯২৫	২৭৮
২২৯	*সখী , আঁধারে একেলা ঘরে*	৬৪	১৯২৫	২৮১
২৩০	*গহন ঘন বনে পিয়াল-তমাল-সহকার-ছায়ে*	৬৪	১৯২৫	২৯৮
২৩১	*আমায় থাকতে দে-না আপন-মনে*	৬৪	১৯২৫	৩০৯
২৩২	*তুমি মোর পাও নাই পরিচয়*	৬৪	১৯২৫	৩৪৭
২৩৩	*যৌবনসরসীনীরে মিলনশতদল*	৬৪	১৯২৫	৩৭৫
২৩৪	*কাহার গলায় পরাবি গানের রতনহার*	৬৫	১৯২৬	০৩
২৩৫	*ছুঁটির বাঁশি বাজল*	৬৫	১৯২৬	২৩
২৩৬	*বাঁশি আমি বাজাই নি কি*	৬৫	১৯২৬	২৪
২৩৭	*বিরস দিন বিরল কাজ*	৬৫	১৯২৬	২৮
২৩৮	*এসো আমার ঘরে এসো*	৬৫	১৯২৬	৬৪
২৩৯	*দে পড়ে দে আমায় তোরা*	৬৫	১৯২৬	৭১
২৪০	*জানি তোমার অজানা নাহি গো*	৬৫	১৯২৬	৭৪
২৪১	*চপল তব নবীন আঁখি দুটি*	৬৫	১৯২৬	৭৭
২৪২	*নূপুর বেজে যায় রিনিরিনি*	৬৫	১৯২৬	১০৫
২৪৩	*নিশীতে কী কয়ে গেল মনে*	৬৫	১৯২৬	১২৭
২৪৪	*আমার লতার প্রথম মুকুল*	৬৫	১৯২৬	১৩৫
২৪৫	*কার চোখের চাওয়ায়*	৬৫	১৯২৬	১৪৬

কালানুক্রমিক নং	কালানুক্রমিক সূচি	বয়স	সাল	গীতবিতানে গানের সিরিয়াল সংখ্যা
২৪৬	*অনেক কথা যাও যে বলে*	৬৫	১৯২৬	১৪৭
২৪৭	*সকালবেলার আলোয় বাজে*	৬৫	১৯২৬	১৬৬
২৪৮	*শেষ বেলাকার শেষের গানে*	৬৫	১৯২৬	১৬৭
২৪৯	*কাঁদার সময় অল্প ওরে*	৬৫	১৯২৬	১৬৮
২৫০	*কেন রে এতই যাবার ত্বরা*	৬৫	১৯২৬	১৬৯
২৫১	*সেই ভালো সেই ভালো*	৬৫	১৯২৬	১৯০
২৫২	*পান্থপাখির রিক্ত কুলায়*	৬৫	১৯২৬	১৯৬
২৫৩	*এ পারে মুখর হল কেকা ওই*	৬৫	১৯২৬	২৫০
২৫৪	*এ পথে আমি-যে গেছি বার বার*	৬৫	১৯২৬	২৭৬
২৫৫	*লিখন তোমার ধুলায় হয়েছে ধূলি*	৬৫	১৯২৬	২৭৯
২৫৬	*মনে রবে কিনা রবে আমারে*	৬৬	১৯২৭	১০
২৫৭	*নিদ্রাহারা রাতের এ গান*	৬৬	১৯২৭	১২
২৫৮	*পুরানো জানিয়া চেয়ো না*	৬৬	১৯২৭	৭৫
২৫৯	*আরো একটু বসো তুমি*	৬৬	১৯২৭	১০৬
২৬০	*গোধুলিগগনে মেঘে*	৬৬	১৯২৭	১০৯
২৬১	*এবার মিলন-হাওয়ায়-হাওয়ায়*	৬৬	১৯২৭	১৩০
২৬২	*ওরে, কী শুনেছিস ঘুমের ঘোরে*	৬৬	১৯২৭	১৪৫
২৬৩	*জয় করে তবু ভয় কেন তোর*	৬৬	১৯২৭	১৫৬
২৬৪	*মুখপানে চেয়ে দেখি, ভয় যে মনে*	৬৬	১৯২৭	১৫৯
২৬৫	*মুখখানি কর মলিন বিধুর যাবার বেলা*	৬৬	১৯২৭	১৬৪
২৬৬	*ওকে বাঁধিবি কে রে*	৬৬	১৯২৭	১৬৫
২৬৭	*যাবার বেলা শেষ কথাটি যাও বলে*	৬৬	১৯২৭	১৭৭
২৬৮	*জানি তুমি ফিরে আসিবে আবার, জানি*	৬৬	১৯২৭	১৭৮
২৬৯	*হায় রে, ওরে যায় না কি জানা*	৬৬	১৯২৭	১৮৬
২৭০	*সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে*	৬৬	১৯২৭	১৮৯

কালানুক্রমিক নং	কালানুক্রমিক সূচি	বয়স	সাল	গীতবিতানে গানের সিরিয়াল সংখ্যা
২৭১	*কাছে যবে ছিলে পাশে হল না যাওয়া*	৬৬	১৯২৭	১৯১
২৭২	*ওগো কিশোর, আজি তোমার দ্বারে*	৬৬	১৯২৭	২২০
২৭৩	*সকরুণ বেনু বাজায়ে কে যায়*	৬৬	১৯২৭	২৪৯
২৭৪	*তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি*	৬৬	১৯২৭	২৫৩
২৭৫	*তুমি আমায় ডেকেছিলে*	৬৬	১৯২৭	২৮৮
২৭৮	*লুকালে ব'লেই খুঁজে বাহির করা*	৬৬	১৯২৭	৩২৫
২৮৯	*ওরে চিত্ররেখাডোরে বাঁধিল কে*	৬৬	১৯২৭	৩৩৪
২৭৮	*দিয়ে গেনু বসন্তের এই গানখানি*	৬৬	১৯২৭	১৫
২৭৯	*অজানা খনির নূতন মণির*	৬৬	১৯২৭	৪০
২৮০	*আজি এ নিরালা কুঞ্জে আমার*	৬৬	১৯২৭	৪১
২৮১	*আমার নয়ন তব নয়নের*	৬৬	১৯২৭	৪৮
২৮২	*আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা*	৬৭	১৯২৮	৪৯
২৮৩	*আরো কিছুখন নাহয় বসিয়ো*	৬৭	১৯২৮	৫০
২৮৪	*হায় অতিথি, এখনি কি হল তোমার*	৬৭	১৯২৮	১৬৩
২৮৫	*বাহির পথে বিবাগি হিয়া*	৬৭	১৯২৮	৩২১
২৮৬	*পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা*	৬৭	১৯২৮	৩২৪
২৮৭	*অনেক দিনের আমার যে গান*	৬৮	১৯২৯	২১
২৮৮	*আমার নয়ন তোমার নয়নতলে*	৬৮	১৯২৯	৯২
২৮৯	*ফুল তুলিতে ভুল করেছি*	৬৮	১৯২৯	৯৩
২৯০	*চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে*	৬৮	১৯২৯	৯৪
২৯১	*কাঁদালে তুমি মোরে*	৬৮	১৯২৯	১৫৭
২৯২	*নীলাঞ্জন ছায়া, প্রফুল্ল কদম্ববন*	৬৮	১৯২৯	২৫৮
২৯৩	*দিনের পরে দিন যে গেল*	৬৮	১৯২৯	২৬০
২৯৪	*প্রভাত-আলোরে মোর কাঁদায়ে গেলে*	৬৮	১৯২৯	২৬৪
২৯৫	*দিনে পরে যায় দিন*	৬৮	১৯২৯	২৭৩

কালানুক্রমিক নং	কালানুক্রমিক সূচি	বয়স	সাল	গীতবিতানে গানের সিরিয়াল সংখ্যা
২৯৬	*সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে*	৬৯	১৯৩০	৩৮
২৯৭	*স্বপনে দোঁহে ছিনু কী মোহে*	৬৯	১৯৩০	১৬০
২৯৮	*গানের ডালি ভরে দে গো*	৭০	১৯৩১	০৭
২৯৯	*একলা ব'সে হেরো তোমার ছবি*	৭০	১৯৩১	৬৯
৩০০	*মিলনরাতি পোহালো , বাতি নেবার বেলা*	৭০	১৯৩১	১৬১
৩০১	*কখন দিলে পরায়ে স্বপন বরণমালা*	৭০	১৯৩১	১৭৬
৩০২	*বাজে করুণ সুরে হায় দূরে*	৭০	১৯৩১	১৯৭
৩০৩	*মম রুদ্ধমুকুল দলে এসো সৌরভ-অমৃতে*	৭২	১৯৩৩	৬৬
৩০৪	*বিজয়মাল্য এনো আমার লাগি*	৭২	১৯৩৩	৭৯
৩০৫	*ওগো তোমার চক্ষু দিয়ে*	৭২	১৯৩৩	৯৬
৩০৬	*হে নবীনা*	৭২	১৯৩৩	৯৭
৩০৭	*ওগো শান্ত পাষানমুরতি সুন্দরী*	৭২	১৯৩৩	৯৮
৩০৮	*তোমার পায়ের তলায় যেন গো*	৭২	১৯৩৩	৯৯
৩০৯	*দুঃখ দিয়ে মেটাব দুঃখ তোমার*	৭২	১৯৩৩	১৩৬
৩১০	*উতল হাওয়া লাগল আমার*	৭২	১৯৩৩	১৮২
৩১১	*না না না) ডাকব না , ডাকব না*	৭২	১৯৩৩	১৮৩
৩১২	*দোষী করিব না , করিব না তোমারে*	৭২	১৯৩৩	২৩৭
৩১৩	*না চাহিলে যারে পাওয়া যায়*	৭২	১৯৩৩	২৬১
৩১৪	*কাছে থেকে দূর রচিল কেন গো*	৭২	১৯৩৩	২৬৯
৩১৫	*এলেম নতুন দেশে*	৭২	১৯৩৩	৩২২
৩১৬	*আমার মন বলে 'চাই , চা ই , চাই গো*	৭২	১৯৩৩	৩৪৩
৩১৭	*আমি ফুল তুলিতে এলেম বনে*	৭২	১৯৩৩	৩৪৪
৩১৮	*হে সখা , বারতা পেয়েছি মনে মনে*	৭৩	১৯৩৪	৪৫
৩১৯	*কোন গহন অরণ্যে তারে এলেম হারায়ে*	৭৩	১৯৩৪	২৬৮
৩২০	*দূরের বন্ধু সুরের দূতীরে*	৭৩	১৯৩৪	৩১৮

কালানুক্রমিক নং	কালানুক্রমিক সূচি	বয়স	সাল	গীতবিতানে গানের সিরিয়াল সংখ্যা
৩২১	*জানি জানি তুমি এসেছ*	৭৪	১৯৩৫	৪৪
৩২২	*এখনো কেন সময় নাহি হল*	৭৫	১৯৩৬	৫১
৩২৩	*এসো এসো পুরুষোত্তম এসো*	৭৫	১৯৩৬	৬৭
৩২৪	*কেটেছে একেলা বিরহের বেলা*	৭৫	১৯৩৬	৭০
৩২৫	*রোদনভরা এ বসন্ত সখী*	৭৫	১৯৩৬	২৫১
৩২৬	*অশান্তি আজ হানল একি দহনজ্বালা*	৭৫	১৯৩৬	২৭০
৩২৭	*স্বপ্নমদির নেশায় মেলা*	৭৫	১৯৩৬	২৭১
৩২৮	*শুনি ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে*	৭৫	১৯৩৬	২৭২
৩২৯	*হে বিরহী , হায় , চঞ্চল হিয়া তব*	৭৫	১৯৩৬	৩১০
৩৩০	*বিনা সাজে সাজি*	৭৫	১৯৩৬	৩২০
৩৩১	*দে তোরা আমায় নূতন করে দে*	৭৫	১৯৩৬	৩২৮
৩৩২	*তোমার বৈশাখে ছিল*	৭৫	১৯৩৬	৩২৯
৩৩৩	*আমার এই রিক্ত ডালি*	৭৫	১৯৩৬	৩৩০
৩৩৪	*আমার অঙ্গে অঙ্গে কে*	৭৫	১৯৩৬	৩৩১
৩৩৫	*কোন্ দেবতা সে কী পরিহাসে*	৭৫	১৯৩৬	৩৩২
৩৩৬	*নারীর ললিত লোভন লীলায়*	৭৫	১৯৩৬	৩৩৩
৩৩৭	*কঠিন বেদনার তাপস দোঁহে*	৭৫	১৯৩৬	৩৩৬
৩৩৮	*সব কিছু কেন নিল না*	৭৫	১৯৩৬	৩৩৭
৩৩৯	*আজি গোধূলিগনে এই বাদলগগনে*	৭৬	১৯৩৭	৫২
৩৪০	*ঘুমের ঘন গহন হতে যেমন আসে স্বপ্ন*	৭৬	১৯৩৭	৬৫
৩৪১	*বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকারে এসেছি*	৭৬	১৯৩৭	১০৭
৩৪২	*মেঘছায়ে সজল বায়ে মন আমার*	৭৬	১৯৩৭	১০৮
৩৪৩	*আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে*	৭৬	১৯৩৭	১১০
৩৪৪	*ওগো আমার-চির অচেনা পরদেশী*	৭৬	১৯৩৭	১৯৪
৩৪৫	*শ্রাবণের পবনে আকুল বিষন্ন সন্ধ্যায়*	৭৬	১৯৩৭	২৬৬

কালানুক্রমিক নং	কালানুক্রমিক সূচি	বয়স	সাল	গীতবিতানে গানের সিরিয়াল সংখ্যা
৩৪৬	*মনে কী দ্বিধা রেখে গেলে চলে*	৭৬	১৯৩৭	২৭৭
৩৪৭	*চিনিলে না আমারে কি*	৭৬	১৯৩৭	৩৩৫
৩৪৮	*ফিরে যাও কেন ফিরে যাও*	৭৭	১৯৩৮	৪২
৩৪৯	*তোমার মনের একটি কথা*	৭৭	১৯৩৮	১১১
৩৫০	*উদাসিনী-বেশে বিদেশিনী*	৭৭	১৯৩৮	১১২
৩৫১	*একদিন চিনে নিবে তারে*	৭৭	১৯৩৮	১৩৭
৩৫২	*জীবনে পরম লগন*	৭৭	১৯৩৮	১৯৮
৩৫৩	*সখী, তোরা দেখে যা*	৭৭	১৯৩৮	১৯৯
৩৫৪	*আমার নিখিল ভুবন*	৭৭	১৯৩৮	২০১
৩৫৫	*না না, ভুল করো না গো*	৭৭	১৯৩৮	২০২
৩৫৬	*ডেকো না আমারে, ডেকো না*	৭৭	১৯৩৮	২০৪
৩৫৭	*যে ছিল আমার স্বপনচারিণী*	৭৭	১৯৩৮	২০৫
৩৫৮	*হায় হতভাগিনী*	৭৭	১৯৩৮	২০৬
৩৫৯	*কোন্ সে ঝড়ের ভুল*	৭৭	১৯৩৮	২০৭
৩৬০	*ছি ছি, মরি লাজে, মরি লাজে*	৭৭	১৯৩৮	২০৮
৩৬১	*শুভ মিলনলগনে বাজুক বাঁশি*	৭৭	১৯৩৮	২০৯
৩৬২	*আর নহে, আর নহে*	৭৭	১৯৩৮	২১০
৩৬৩	*ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে*	৭৭	১৯৩৮	২১১
৩৬৪	*যাক ছিঁড়ে, যাক ছিঁড়ে যাক*	৭৭	১৯৩৮	২১২
৩৬৫	*দুঃখের যজ্ঞ-অনল-জ্বলনে*	৭৭	১৯৩৮	২১৩
৩৬৬	*আমার মন কেমন করে*	৭৭	১৯৩৮	২১৪
৩৬৭	*গোপন কথাটি রবে না গোপনে*	৭৭	১৯৩৮	২১৫
৩৬৮	*বলো সখী, বলো তারি নাম*	৭৭	১৯৩৮	২১৬
৩৬৯	*ধরা সে যে দেয় নাই*	৭৭	১৯৩৮	২১৮
৩৭০	*কোন্ বাঁধনের গ্রন্থি বাঁধিল*	৭৭	১৯৩৮	২১৯

কালানুক্রমিক নং	কালানুক্রমিক সূচি	বয়স	সাল	গীতবিতানে গানের সিরিয়াল সংখ্যা
৩৭১	*নীরবে থাকিস , সখী*	৭৭	১৯৩৮	৩৩৮
৩৭২	*প্রেমের জোয়ারে ভাসাব দোঁহারে*	৭৭	১৯৩৮	৩৩৯
৩৭৩	*জেনো প্রেম চিরঋণী*	৭৭	১৯৩৮	৩৪০
৩৭৪	*আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া*	৭৮	১৯৩৯	৪৩
৩৭৫	*আমি আশায় আশায় থাকি*	৭৮	১৯৩৯	২০০
৩৭৬	*অজানা সুর কে দিয়ে যায়*	৭৮	১৯৩৯	২১৭
৩৭৭	*তুমি কোন্ ভাঙনের পথে এলে*	৭৮	১৯৩৯	২২১
৩৭৮	*আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি*	৭৮	১৯৩৯	২২২
৩৭৯	*এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে*	৭৮	১৯৩৯	২২৩
৩৮০	*বসন্ত সে যায় তো হেসে*	৭৮	১৯৩৯	২২৪
৩৮১	*মম দুঃখের সাধন যবে করিনু*	৭৮	১৯৩৯	২২৫
৩৮২	*বাণী মোর নাহি*	৭৮	১৯৩৯	২২৬
৩৮৩	*আজি দক্ষিণপবনে*	৭৮	১৯৩৯	২২৭
৩৮৪	*যদি হায় জীবন পূরণ নাই হল মম*	৭৮	১৯৩৯	২২৮
৩৮৫	*আমার আপন গান আমার অগোচরে*	৭৮	১৯৩৯	২২৯
৩৮৬	*অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দোবন্ধনে*	৭৮	১৯৩৯	২৩০
৩৮৭	*আমি যে গান গাই জানিনে সে*	৭৮	১৯৩৯	২৩১
৩৮৮	*ওগো পড়োশিনি*	৭৮	১৯৩৯	২৩২
৩৮৯	*ওগো স্বপ্নস্বরূপিণী , তব অভিসারে*	৭৮	১৯৩৯	২৩৩
৩৯০	*ওরে জাগায়ো না*	৭৮	১৯৩৯	২৩৪
৩৯১	*দিনান্তবেলায় শেষের ফসল*	৭৮	১৯৩৯	২৩৫
৩৯২	*ধূসর জীবনের গোধুলিতে ক্লান্ত আলোয়*	৭৮	১৯৩৯	২৩৬
৩৯৩	*দৈবে তুমি কখন নেশায়*	৭৮	১৯৩৯	২৩৮
৩৯৪	*ধূসর জীবনের গোধুলিতে ক্লান্ত মলিন যেই স্মৃতি*	৭৮	১৯৩৯	২৫৬
৩৯৫	*আমার যেতে সরে না মন*	৭৮	১৯৩৯	৩৯৫

তৃতীয় পর্বের গানের ষাট থেকে আটষট্টি বছর বয়সের গানের ভাব বিশ্লেষণে, দ্বিতীয় পর্বের গানের ভাবের রেশ কিছুটা পাবো। কবির মনে যে গান বাজে তা তিনি প্রিয়তমাকে বলছেন, রবির কিরণ ফুলের শিশিরকে যেমন টেনে নেয়, তেমনি কি সে কবির প্রাণের গান কে গ্রহণ করে। ষাট বছর বয়সে কবি বলেছেন-

আমার মনের মাঝে যে গান বাজে শুনতে কি পাও গো
আমার চোখের পরে আভাস দিয়ে যখনি যাও গো ॥ ...

কবির মনে প্রিয়তমের একটা সুর বা গান চিরকালই বিরাজমান ছিল। সেই সুরকে নিয়েই তার প্রেমপর্যায়ের গানের এত বিচিত্র সমাহার। তাঁর প্রেমপর্যায়ে গানের রচনায় প্রিয়তমের সুরটি প্রকৃতির সুরের সাথে মিলিয়ে যে গান রচনা করে গিয়েছেন, তা তিনি বার বার স্মরণ রাখার কথা বলেছেন। পরিণত বয়সে তাইতো কবি অনাদরে অবহেলায় যে গান গেয়েছেন, জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায় তা তিনি মনে রাখার কথা বলেছেন। কবি বলেছেন-

এই কথাটি মনে রেখো, তোমাদের এই হাসিখেলায়
আমি যে গান গেয়েছিলাম জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়।
শুকনো ঘাসে শূন্য বনে, আপন-মনে
অনাদরে অবহেলায়
আমি যে গান গেয়েছিলেম জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায় ॥....

'কোন উদাসীন' বলে কবি বেশ কয়েকটি গানে এক অজানা কল্পনা প্রেয়সীর কথা বলেছেন। এমনি একটি গান 'আসা যাওয়ার পথের ধারে গান গেয়ে মোর কেটেছে দিন...'। গানটির শেষ অন্তরায় তিনি চৈত্রমাসের পড়ে থাকা শুকনো ঘাসে তার মনের কথাটি কুঁড়িয়ে পাওয়ার কথা বলেছেন এভাবে-

... কিছু বা কোন্ চৈত্রমাসে বকুল-ঢাকা বনের ঘাসে
মনের কথার টুকরো আমার কুড়িয়ে পথে কোন উদাসীন।

পরিণত বয়সের গানের ভিতর দিয়ে কবি বিদায়ের নানা ব্যঞ্জনা নানান ভাবে প্রকাশ করেছেন। এবারের গানটিতে কবি নিষিদ্ধ প্রেমের ক্ষণিক মিলনাবসানে প্রভাতের লজ্জিত বিদায়ের কথা বলেছেন এভাবে-

হে ক্ষণিকের অতিথি-
এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া
ঝরা শেফালির পথ বাহিয়া ॥...

পূর্বেই বলেছি প্রেমপর্যায়ের গানের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য প্রেমিকা রবীন্দ্রনাথের গানে কোথাও স্পষ্ট রেখায় চিহ্নিত নয়। কবি ইঙ্গিত প্রতিমায় প্রেমিকার উপস্থিতি নিশ্চিত করেছেন। *সোনার তরীর* মানস সুন্দরী কবিতায় কবি যাকে প্রকৃতির মাধুর্যসার দিয়ে বিশ্বমোহিনী শোভাময়ী মানসী মূর্তিকে এঁকেছেন, পয়ষট্টি বছর বয়সে তিনি গানে সেই স্মৃতি উদ্বোধন করছেন নিসর্গ বিশ্বের মধ্য দিয়েই-

লিখন তোমার ধুলায় হয়েছে ধূলি
হারিয়ে গিয়েছে তোমার আখরগুলি।
চৈত্ররজনী আজ বসে আছি একা, পুন বুঝি দিল দেখা-
বনে বনে তব লেখনীলীলার রেখা,
নবকিশলয়ে গো কোন্ ভুলে এল ভুলি তোমার পুরানো আখরগুলি।
মল্লিকা আজি কাননে কাননে কত
সৌরভে-ভরা তোমারি নামের মতো।
কোমল তোমার অঙ্গুলি-ছোঁওয়া বাণী মনে দিল আজি আনি
বিরহের কোন্ ব্যথাভরা লিপিখানি
মাধবীশাখায় উঠিতেছে দুলি দুলি তোমার পুরানো আখরগুলি।

আবার কবি মিলন স্মৃতিরোমান্থন করছেন এভাবে-

সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে, ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা
সেই স্মৃতিটুকু কভু খনে খনে যেন যাগে মনে, ভুলো না ॥ ...

প্রেমপর্যায়ের গানে 'প্রেমিকা' নাম না জানা অতিথির মতো, জীবনের চলার পথে কবি তার অপেক্ষায় থাকেন। অতিথির সাথে হঠাৎ দেখার, সেই প্রতীক্ষা যেন এক অসীম প্রতিক্ষা। পরিণত বয়সের শেষের দিকে কবি তাঁর গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের অনেক গানকে প্রেমপর্যায়ে অর্ন্তভুক্ত করেছেন। যেমন- 'কেটেছে একেলা বিরহের বেলা' 'রোদনভরা বসন্ত', 'শুনি ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে', 'আমার এই রিক্ত ডালি', 'নারীর ললিত লোভনলীলায়' প্রভৃতি গান। প্রেমের গানের কালানুক্রমিক সূচির শেষের দিকের গানে 'বাদল দিনে' কিংবা 'বর্ষায়' কবির মনে যে অপেক্ষার অকারণপুলকে চোখের জলে ফেলেছেন তার আভাস পাওয়া যায়। যেমন-

আজি গোধুলিলগনে এই বাদলগগনে
তার চরনধ্বনি আমি হৃদয়ে গণি-
'সে আসিবে' আমার মন বলে সারাবেলা,
অকারণ পুলকে আঁখি ভাসে জলে ॥..

কিংবা-

বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকারে এসেছি তোমারি এ দ্বারে,
পথিকেরে লহো ডাকি তব মন্দিরের এক ধারে ॥...

রবীন্দ্রনাথের সাতাত্তর বছর বয়সে যৌবনের 'উদাসিনী-বিদেশিনী' তাঁর কল্পনায় আবার ছবি এঁকেছে। তিনি বলেছেন-

উদাসিনী বেশে বিদেশিনী কে সে নাইবা তাহারে জানি,
রঙে রঙে লিখা আঁকি মরীচিকা মনে মনে ছবিখানি ॥...

শেষ বয়সে মরীচিকার মত সেই ছবি কবির মনে ফিরে আসে। আটাত্তর বছর বয়সে কবির ভাবনা-যে প্রেয়সী কবিকে মাধুরী দান করেছে সমগ্র জীবপাত্র উচ্ছলিয়া, তাকে এই বিদায় বেলায় তিনি স্মরণ করেছেন। জীবনে যে তাঁকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে সেই কথা তিনি প্রকাশ করেছেন। বলছেন-

আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান-
তুমি জান নাই, তুমি জান নাই,
তুমি জান নাই তার মূল্যের পরিমাণ ॥

শ্যামা নৃত্যনাট্যে গানটি প্রেমের ত্যাগের মূল্য দিতে গিয়ে উত্তীয়ের কণ্ঠে গীত হয়। প্রেমপর্যায়ের গান হিসাবে ভাবলে আমরা কবির ব্যক্তিগত ভাবনার কথাই আলোচনা করব, নাটকের গান হিসেবে নয়। কালানুক্রমিক সূচি এবং *গীতবিতানে* প্রেমের গানের সর্বশেষ গান-

আমার যেতে সরে না মন-
তোমার দুয়ার পারায়ে আমি যাই যে হারায়ে
অতল বিরহে নিমগন ॥
চলিতে চলিতে পথে সকলই দেখি যেন মিছে,...
...তোমায় কিছু দেওয়া হল না যে।
যবে চলে যাই পদে পদে বাধা পাই,
ফিরে ফিরে আসি অকারণ ॥

আটাত্তর বছর বয়সে কবির প্রেমপর্যায়ের সর্বশেষ রচিত গান। জীবনের একদম শেষ সময়ে এসেও কবি তাঁর সেই কল্পনার প্রেয়সী কে ছেড়ে যেতে চান না। তিনি মনে করেন তাঁর অনেক কিছু দেবার ছিলো, তবে এই নিখিল ভুবনের সবকিছুই তাঁর কাছে মিথ্যা লাগে, যেন এক মিছে মায়া তাঁকে সবসময় তাড়িয়ে বেড়ায়। সকল বাঁধা পার করে তবুও সেই নিখিলে কবির অকারণ বিচরণ। এই গানে প্রকৃতি, প্রেম ও ঈশ্বর সকলেরই মিলনের প্রকাশ, কারণ এসময় তাঁর কল্পনা প্রেয়সী জীবনদেবতায় রুপান্তরিত হয়েছে।

পরিশেষে বলতে চাই, প্রেমের গানের 'মিলন ও বিরহ' কে কালানুক্রমিক সূচির মাধ্যমে কবির প্রেমচেতনার একটা রূপ দেবার চেষ্টা করেছি। ফলে দেখা গেছে ভাবে ছন্দপতন ঘটলেও, পাঠক গানের তালিকা থেকে প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণে একটা ধারণা পাবেন। এবং সেই সাথে কীভাবে বিচিত্র প্রেমের ভাবনা ও চেতনাবোধ নানান বয়সে নানান রুপে প্রকাশ পেয়েছে তা স্পষ্ট হবে। প্রেমের গানগুলিতে কবির পরিপূর্ণ ভাবের প্রকাশ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথেরই প্রেমের গানের দুটি লাইন দিয়ে এই পরিচ্ছেদটি শেষ করব-

অনেক দিনের আমার যে গান আমার কাছে ফিরে আসে
তারে আমি শুধাই, তুমি ঘুরে বেড়াও কোন বাতাসে ॥

তথ্যসূত্র

১. ড. অরুণকুমার বসু, *বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত*, প্রকাশনা : দে'জ পাবলিশিং, প্রকাশকাল : আগষ্ট ১৯৯৪, পৃ. ৪৭০, ৪৭৩

২. স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়, *সমকালের বাংলাগান ও রবীন্দ্রসংগীত*, প্রকাশনা : প্যাপিরাস, প্রকাশকাল : ফেব্রু ১৯৯২, পৃ.-২৪

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, প্রকাশনা : বিশ্বভারতী, প্রকাশকাল : মাঘ ১৪২১

৩য় পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রেম ও পূজা

গীতবিতানে পূজাপর্যায়ের গানের সংখ্যা ছয়শত সতেরো (৬১৭)। এর মধ্যে রয়েছে একুশটি (২১) উপবিভাগ। কবির সমগ্র রচনায় আমরা পাই মানুষ, প্রকৃতি ও ব্রহ্ম এই তিন ধারার মিশ্রণ। তাঁর গানে প্রেম যেমন পূজায় রূপান্তরিত হয়, আবার কখনও পূজা প্রেমেও রূপান্তরিত হয়। 'পূজা ও প্রার্থনা' পর্যায়ে *গীতবিতানে* আরও একটি পর্যায় আছে যেখানে গানের সংখ্যা তিরাশিটি (৮৩)। 'প্রেম ও প্রকৃতি' নামে একশত পাঁচটি (১০৫) গান নিয়ে আলাদা পর্যায় রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচিত গানগুলিকে নিজে ভাব অনুসারে পর্যায় বিভাগ করে *গীতবিতানে* সাজিয়েছেন। কলিকাতা, শিলাইদহ ও শান্তিনিকেতন তাঁর সমগ্র রচনার তিনটি জগৎ। পারিবারিক আবহ, বিলাত ভ্রমণ ও সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনদর্শন, সাহিত্য চর্চায় ও সংগীত চর্চায় বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। রবীন্দ্রনাথের পূজাপর্যায়ের গানে ঈশ্বর ভাবনার যে রূপটি পাই সেটি তার পরিবারিক ও পারিপার্শ্বিক দুটোরই প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত। পরবর্তীতে বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর শুধু আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, কবি ঈশ্বরকে পেয়েছিলেন নিজস্ব রূপে, জীবনদেবতা রূপে। তাই রবীন্দ্রনাথের গানে 'প্রেম ও পূজা'য় পাওয়া যায় যুগলমিলন। এখন রবীন্দ্রনাথের পূজাপর্যায়ের গানে ঈশ্বর ভাবনার রূপটি কীভাবে প্রভাবিত হয়েছিল তা আলোকপাত করব।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্মের অনুসারী। কিশোর বয়সে ঈশ্বরচিন্তায় মূল ছিল বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান ধর্মমত, পথ নির্বিশেষে অখণ্ড লীলারূপে আনন্দচিন্তা। ব্রাহ্ম ভাবধারার প্রভাব এসময় স্পষ্ট পাওয়া যায়। ঠাকুরপরিবারে হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণদের লোকাচার ও ধর্ম সংস্কারগুলি সে সময় নিষ্ঠার সাথে পালন করা হতো। *রবীন্দ্রজীবনী* অনুসারে- "১৮৭৩ মাঘোৎসবের পক্ষকালে রবীন্দ্রনাথের এগারো বৎসর নয় মাস বয়সে উপনয়ন হয়।"[১] কোনরকম পৌত্তালিকতা ছাড়া ব্রাহ্মণ্য সকল নিয়ম পালন করে উপনয়নক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল। উপনয়নের পর নতুন ব্রহ্মচারীকে গায়ত্রীমন্ত্র জপ করতে হয়। কবির উপর ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থোদ্ধৃত উপনিষদাদি মন্ত্রের ও বিশেষভাবে গায়ত্রীমন্ত্রের প্রভাব অতীব গভীর ছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন- "নূতন ব্রাহ্মণ হওয়ার পরে গায়ত্রীমন্ত্রটা জপ করার দিকে খুব-একটা ঝোঁক পড়িল।"[২]

উপনয়নের পর কবি পিতার সাথে হিমালয় বেড়াতে যান। তাঁকে সাথে নেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল বাড়ির বদ্ধ পরিবেশ থেকে সরিয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যের সাথে পরিচয় ঘটানো। সেখানে দেবেন্দ্রনাথ কিশোর কবির কণ্ঠে ব্রহ্মসংগীত শুনতেন। হিমালয় ভ্রমণের এই দিনগুলি স্মরণ করে কবি বলেন-

"যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিত পিতা বাগানের সম্মুখে বারান্দায় আসিয়া বসিতেন। তখন তাঁহাকে ব্রহ্মসংগীত শোনাইবার জন্য আমার ডাক পড়িত। চাঁদ উঠিয়াছে, গাছের ছায়ার ভিতর দিয়ে জ্যোৎস্নার আলো বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছে, আমি বেহানো গাহিতেছি-

তুমি বিনা কে প্রভু সংকট নিবারে

কে সহায় ভব অন্ধকারে-

তিনি নিস্তব্ধ হইয়া নতশিরে কোলের উপর দুই হাত জোড় করিয়া শুনিতেছেন, সেই সন্ধ্যা বেলাটির ছবি আজও মনে পড়িতেছে।"[৩]

এবার একটু পিছনের দিকে তাকাই, রাজা রামমোহনের হাত ধরে বাংলা গানে বৈরাগ্য ও নিরাসক্ত ঈশ্বরভক্তির প্রচার শুরু হয়। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্মের প্রচারে তাঁকে সহযোগিতা করেন। ফলে ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ জন্মের পর থেকেই দেখে এসেছিলেন ব্রহ্মসংগীত চর্চা। তাঁর পিতা, দাদারা ব্রহ্মসংগীত রচনা করতেন। অন্যান্যদের রচিত গানও বাড়িতে চর্চা হত। ফলে অগ্রজদের প্রভাব তাঁর ঈশ্বর চিন্তায় ছিল। তিনি তাঁদের দৃষ্টান্তে প্রথম দিকে ব্রহ্মসংগীত গুলি রচনা করেন। সেই সময়ের ব্রহ্মসংগীত গুলোতে ব্রহ্মের গুণকীর্তন, সৃষ্টিপ্রকরণ, ব্রহ্মচিন্তায় আত্মিক উন্নতির মহিমা প্রকাশই প্রাধান্য ছিল। ফলে, রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের (১৮৮১-১৯০০) গানগুলিতে আমরা ঈশ্বর আরাধনার প্রকাশ দেখতে পাই। এ সময় তিনি ঈশ্বর কে কেবলই প্রভু, পিতা, সেবক, মঙ্গলময়, ব্রহ্ম, প্রেমময়, রাজা, নাথ ইত্যাদি সম্বোধনে স্মরণ করেছেন। যেমন-

কোথা আছ, প্রভু, এসেছি দীনহীন

আলয় নাহি মোর অসীম সংসারে!

অতি দূরে দূরে ভ্রমিছি আমি হে

'প্রভু' 'প্রভু' ব'লে ডাকি কাতরে ॥...

[রচনাকাল: ১৮৮১]

আরো একটি গান-

ওহে জীবনবল্লভ, ওহে সাধনদুর্লভ,

আমি মর্মের কথা অন্তরব্যথা কিছুই নাহি কব

শুধু জীবন মন চরণে দিনু বুঝিয়া লহো সব।

আমি কী আর কব ॥...

[রচনাকাল : ১৯০০]

ঈশ্বরের প্রতি এক সহজ নিবেদন ছিল এসময়ের আবেদনে। অতিবাহিত জীবনে সে ঈশ্বরের আরাধনা সঠিক ভাবে পালন করেবেন, পাপ-ত্যাগে দৃঢ় সংকল্প, পৃথিবীর সেবা করবেন ইত্যাদি ভাবের প্রকাশ। এসময় রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর ভাবনা বেশ আনুষ্ঠানিক। দূর থেকে সে ঈশ্বরের সেবায়, স্তুতিতে মগ্ন।

ঠাকুরবাড়িতে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত চর্চার যে জোয়ার ছিল তা সে সময় বাড়ির তরুণদের শেখা ছিল স্বভাবগত। হিন্দিগান ভেঙে বাংলাগান রচনা বিশেষ করে ব্রহ্মসংগীত রচনা করা ছিল ঠাকুর পরিবারের নবীন ও তরুন স্রষ্টার

কাছে নেশার মত। রবীন্দ্রনাথ যৌবনকাল পর্যন্ত রচিত রবীন্দ্রসঙ্গীত গুলিতে মার্গ-সঙ্গীতের প্রভাব দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল। মাঘোৎসব ও অন্যন্য ধর্ম সমাজের উৎসব উপলক্ষে রচিত অন্যান্য গানুগুলোও সবই প্রায় হিন্দি ভাঙা গান ছিল। অধ্যাপক রমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধে লিখেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ-

"আনুমানিক ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে সংগীতাচার্য রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী ও শ্যামসুন্দর মিত্রের সংস্পর্শে আসেন। ইহাদের নিকট বহুসংখ্যক ধ্রুপদ ও খেয়াল সংগ্রহ করিয়া তাহার অনুকরণে ব্রহ্মসংগীত রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ রচিত ধর্মসংগীতের মূল হিন্দি গানের অধিকাংশই রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত সঙ্গীতমঞ্জরী ও গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত সংগীতচন্দ্রিকা গ্রন্থে প্রকাশিত আছে। এতদ্ব্যতীত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রণীত কণ্ঠকৌমুদী ও কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গীতসূত্রসার গ্রন্থে কিছু কিছু মূল গান প্রকাশিত আছে।"[৪]

নিরাকার উপাসনা ও সত্যধর্মের পালনই ছিল ব্রাহ্মধর্মের উপজীব্য বিষয়। হিন্দুদের পৌত্তালিক উপাসনার সাথে তাঁদের মতবিরোধ থাকলেও, ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্যের সাথে কোন বিরোধ ছিল না। ব্রহ্মসংগীত গুলোতে শুরুর দিকে ব্রহ্মের মহিমা প্রকাশই মূল উপজীব্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেও শুরুর রচনাগুলোতে ঈশ্বরকে পিতা রূপে কল্পনায় তাঁর মহিমা বর্ণনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের পূজাপর্যায়ের গানগুলোকে দুইটি শ্রেণিতে ভাগ করলে আমরা পাই, প্রথমত ব্রহ্মসংগীত, দ্বিতীয়ত- তাঁর নিজস্ব ধর্মবোধ, ভক্তিপ্রেরণা ও জীবনদৃষ্টি থেকে- সৃষ্ট পূজার গান।
রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর চেতনার প্রাথমিক পর্বে ব্রাহ্ম ভাবধারা স্পষ্ট ছিল, মহর্ষিদেবের প্রভাব ও ঠাকুরবাড়ির প্রভাব থাকলেও তিনি নিজে কোন নির্দিষ্ট ধর্মের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকেননি। আবাল্য যে তিনি ঈশ্বর বিশ্বাসের ছায়ায় বড় হয়েছেন তা তিনি 'The Religion Of Man' এ বলেছেন এভাবে-

"This thought of God has not grown in my mind through any process of philosophical reasoning, on the contrary, it has followed the current of my temperament from early days until it suddenly flashed into my consciousness with a direct vision."[৫]

যদুভট্টের 'রুমঝুম বারখে আজু বাদারবা পিয়া বিদেশ মোরি' গানটি থেকে সুর গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ ভক্তি উপাসনার গান রচনা করেছেন-

শূণ্য হাতে ফিরি, হে নাথ, পথে পথে-
ফিরি হে দ্বারে দ্বারে
চিরভিখারি হৃদি মম নিশিদিন চাহে কারে।...

তিনি এমন আরও অনেক হিন্দিভাঙা গান রচনা করেছেন। পারিবারিক এই ধারার প্রভাব বেশিদিন কবির স্থায়ী হয় নাই। তিনি যেমন আবাল্য ঈশ্বর বিশ্বাসের ছায়ায় বড় হয়েছেন, তেমনি ক্রমশ পরিণত বয়সে কবির প্রার্থনা বা ভক্তিগীতি গুলি ব্রাহ্মধর্মের আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনকে অতিক্রম করে কবি মনে একটি স্বাধীন অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর ভাবনায় পারিবারিক প্রভাব ও পরবর্তীতে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরচিন্তার যে কথা বলা হয়েছে তা রবীন্দ্রজীবনীকারের মন্তব্য থেকে আরও স্পষ্ট হবে। যেমন-

"রবীন্দ্রনাথের বিশ বৎসর বয়সে রচিত ব্রহ্মসংগীতগুলি ভগবৎভক্তিপ্রণোদিত আধ্যাত্মিক সংগীত বলিয়া স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। জীবনস্মৃতির একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন, 'আমাদের পরিবারের যে ধর্ম সাধনা ছিল আমার সঙ্গে তাহার কোনো সংস্রব ছিল না- আমি গ্রহণ করি নাই।' রবীন্দ্রনাথের একথা লিখিবার অর্থ কী বলা কঠিন, কারণ দেখা যায়, প্রতি বৎসর নববর্ষ বা মাঘোৎসবের সময় তিনি বহু ব্রহ্মসংগীত রচনা করিতেছেন। এক্ষেত্রে পরিবারের ধর্ম সাধনার সহিত তাহা সংস্রবহীন বলিয়া কিরূপে স্বীকার করা যায়? তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম বয়সে যে সব ব্রহ্মসংগীত রচনা করিয়াছিলেন, সে সব সামাজিক কর্তব্যপালনের জন্য লেখা, ধর্ম বিশ্বাস বা আধ্যাত্মিক আন্তরিকতা হইতে উৎসারিত নহে। গানের সুরে মুক্তি আসে নাই, অধিকাংশ গানই মার্গসংগীতের বাঁধা পথের পথিক।"[৬]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনব্যাপী মৃত্যু, শোক ও দুঃখকে আলিঙ্গন করে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছেন। এগুলো তাঁর জীবনে কখনও নেতিবাচক হিসেবে প্রভাবিত করেনি। কারণ তিনি শক্তি আহরণ করেছেন মৃত্যু-শোক-দুঃখ থেকে। তিনি দুঃখ ও সৃষ্টির তত্ত্বকে এক সঙ্গে বাঁধা বলে বিশ্বাস করতেন। জগৎ হল গতিশীল, যে এই জগৎ সংসারে সামনের দিকে ধাবমান হবে তাকে অবশ্যই শুধু মৃত্যুতে নয়, জীবনের সকল বাঁধাকে পরিত্যাগ করতে হবে। আর এই পরিত্যাগটাই যেন দুঃখ। সৃষ্টি যদি একটি সীমার মধ্যে অবস্থিত হত তাহলে হয়ত 'দুঃখ' শব্দটি থাকত না। সৃষ্টি অসীম, মানুষও তাই নিজেকে একটি সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চায় না। মানুষও চায়- 'সীমার মাঝে অসীমের যোগসাধন'। তাইতো রবীন্দ্রনাথ 'ইতিবাচক ও নেতিবাচক' দু'টোকেই গ্রহণ করেছেন বলেই সুখের মাঝে যাকে দেখেছেন, দুঃখে তাকেই প্রাণভরে পেয়েছেন। তাঁর 'পূজা ও প্রার্থনা' পর্যায়ের গানে তিনি বলেছেন-

সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি
দুঃখে তোমায় পেয়েছি প্রাণ ভ'রে।
হারিয়ে তোমায় গোপন রেখেছি,
পেয়ে আবার হারাই মিলনঘোরে ॥...
... তবু তুমি সেই তো আমার তুমি-
আবার তোমায় চিনব নূতন ক'রে ॥...

রবীন্দ্রনাথের গানে আনন্দ পেতে শ্রোতাদের একটি বিষয়ে কম গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক, তা হল- 'ঐতিহাসিক অনুসন্ধান ও জ্ঞানবোধ'। কারণ, ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে আমাদের জ্ঞান চর্চায় সহায়ক হলেও সত্যিকারের গানের আনন্দ পেতে গানটি শোনা, পড়া বা গাওয়ার সময় সেই জ্ঞানটি মনে না রাখাই শ্রেয়। কবির জীবনে আন্না তরখড়, কাদম্বরী দেবী, ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো সহ অনেকেরই মধুর সম্পর্কের অভিজ্ঞতা ছিল। সেই সম্পর্কের প্রভাব তাঁর কাব্য বা গানকে মধুময় করলেও সেই প্রেরণাই কি সব? অনেকেই প্রেমের গানের প্রভাব

বলতে শুধু ব্যক্তি-জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকপাত গুলি করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের 'প্রেম' শুধু ব্যক্তি প্রেমের উপলব্ধি নয়, তাঁর প্রেম পূজার সমাদরে স্থান পায়। যেমন একটি উদাহরণ- 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা'। গানটির কথা আসলেই শ্রোতার নিকট আমরা 'কাদম্বরী' দেবীকে উৎসর্গকৃত গান হিসেবে বেশি পরিচিত করিয়ে দিতে চাই। গানটি তাঁর বৌঠানের উদ্দেশ্যে রচিত হলেও আমরা বুঝতে পারি সম্পর্কটি কতটা মহৎ মর্যাদার ছিল এবং গানটি সেই মর্যাদা রক্ষা করেছে বলেই পূজাপর্যায়ের গান হিসাবে অন্তর্ভূক্ত আছে। ব্রহ্মসংগীত হিসাবে এটি সগৌরবে গীত হয়ে আসছে।

ব্রাহ্ম ভাবধারায় রাজা রামমোহন রায় ঈশ্বরের একত্ব, নিরাকার তত্ত্ব ও অনন্ত-ঐশ্বর্য সম্পর্কে আপোষহীন মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই মনোভাবের বিষয়টি জানতেন, তাঁর পিতা ও ভ্রাতাদের এই আদর্শ অনুযায়ী গান রচনা করতে দেখেছিলেন। বাড়ির জ্যেষ্ঠদের এই আদর্শ অনুযায়ী তিনিও অনেক ব্রহ্মসংগীত রচনার ধারা অবলম্বনে অগ্রসর হয়েছেন। যেমন-

ওঠো ওঠো রে বিফলে প্রভাত বহে যায় রে
মেলো আঁখি জাগো জাগো, থেকো না রে অচেতন ॥
সকলেই তাঁর কাজে ধাইল জগতমাঝে
জাগিল প্রভাতবায়ু ভানু ধাইল আকাশপথে ॥

রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর ভাবনার আর একটি নতুন মোড় নেয় ১৮৯০ সালে শিলাইদহ ও শাহজাদপুরে জমিদারি দেখাশোনার কাজে এসে। এখনকার প্রকৃতি, মানুষ পদ্মার সৌন্দর্য কবিকে নতুন করে ভাবতে সাহায্য করে। এখনকার বাউলদের সংস্পর্শে এসে ও বাউল গান শুনে তিনি অনুপ্রাণিত হন। সহজ, সরল ভাষা ও সুর কবিকে মুগ্ধকরে। সর্বকালের সেরা দার্শনিকদের একজন লালনশাহ্। এই বাউল কবির গান এবং বিশেষে করে তাঁদের যে ধর্মমত, তা দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন। জমিদারি দেখার কাজে তিনি তাঁর জীবদ্দশায় অনেকবার শিলাইদহতে আসেন। ছোটবেলায় রবীন্দ্রনাথ তাঁদের বাড়িতে বাউল বৈরাগীদের গান শুনেছেন । কিন্তু সে সময় কবির দেখা বাউল, আর শিলাইদহে এসে বাউলদের সংস্পর্শে থেকে জানা দু'টো দুই রকমের অভিজ্ঞতা। কবি বুঝতে পেরেছিলেন ঋষিরা যে উচ্চমানের ভাবে ও ভাষায় ঈশ্বর সম্পর্কে বলেছেন, বাংলার নিরক্ষর বাউলরা সেই কথা সহজ 'গানে ও দর্শনে' প্রকাশ করেছেন। উপনিষদের কঠিন ভাষায় পরমেশ্বরের সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছেন, বাউলরা সেই কথাই অতি সহজে তাঁদের ঈশ্বর সম্পর্কে বলেছেন। বাউলরা রূপক করে ঈশ্বরকে মনের মানুষ বলেছেন। রবীন্দ্রনাথও নিজেকে বাউল ভেবে প্রাণের মানুষের কথা বলেছেন যেমন-

আমি কোথায় পাব তারে-
আমার মনের মানুষ যে রে...

আর রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে,

তাই হেরি তায় সকল খানে॥

আছে সে নয়নতারায় আলোক-ধারায় তাই না হারায়...

বাউলদের উদার মনুষ্যবাদ কবি কে আকর্ষণ করেছিল। বাউলদের মত ঈশ্বরকে মনের মানুষ বলে স্বীকার করতে তিনি মোটেও কুণ্ঠিত হননি। তিনি সহজেই নিজেকে বাউল বলে ভাবতে পেরেছিলেন। কৈশোরের রাধা-কৃষ্ণ লীলা কাহিনী নিয়ে বৈষ্ণবীয় ভাষায় পদ রচনা করেছিলেন, কিন্তু বিষয়টি ব্রাহ্মভাব বিরোধী হওয়ায় তা নিয়ে নির্দিষ্ট কিছু পদরচনার পর আর বেশি দূর আগান নাই। শিলাইদহে এসে দেখলেন বাউলরা সাবলীল ভাবে কীর্তন সঙ্গীত করছেন, চৈতন্য নিয়ে গান গাইছেন। চৈতন্য ও তাঁর পরবর্তী দার্শনিকরা রাধা-কৃষ্ণ কাহিনীর মধ্যদিয়ে 'সীমা ও অসীমের' ব্যাখ্যা করছেন,তখন রবীন্দ্রনাথও তাঁর নিজের মতো করে এগুলি গ্রহণ করলেন। রবীন্দ্রনাথের মনে পৌত্তলিক কৃষ্ণকাহিনী নতুন রূপে জন্মলাভ করেছিল। কবি পরমেশ্বর সম্পর্কে ও মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে যেখানেই উদার সর্বজনীনতা দেখেছেন সেখানেই তাঁর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তিনি তাঁর নিজস্বতা দিয়ে রচিত গানে ঈশ্বর ভক্তি প্রকাশ করেছেন। তাঁর কাছে ঈশ্বর এক, মনুষ্যসৃষ্টি এক, বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বকে অনুভব করাই মানুষের প্রধান কর্তব্য। যেমন-

"উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি যে ধর্মমত পেয়েছিলেন, সে সূত্রে তিনি দোর্দন্ড প্রজ্ঞাশালী যে ঈশ্বরকে পেয়েছিলেন, সেখান থেকে তিনি বহুদূর সরে যান। তিনি এমন এক আশ্চর্য মধুর-সুন্দর-কোমল-কঠোর ঈশ্বরকে আবিষ্কার করেন যাঁকে ইয়াত্তাহীন মাত্রায় অনুভব করা সম্ভব, যাঁর সঙ্গে না রামমোহনের, না দেবেন্দ্রনাথের, না অন্য কারো ঈশ্বর মেলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর, তিনি কবির পরমেশ্বর।"[৭]

বাউলদের জাতিধর্ম নির্বিশেষে সংসারের সকলের সঙ্গে সহজ মিলন ঘটে বলে তাঁদের অপর নাম 'সহজিয়া'। বিশ্বের সঙ্গে তাঁদের সৃষ্টি হয় এক গভীর ঐক্যতান। তাইতো রবীন্দ্রনাথ এদিক থেকে বাউলদের সাথে মিল খুঁজে পেয়ে তাঁর জীবনদেবতার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন-

"বিশ্বদেবতা আছেন, তাঁর আসন লোকে লোকে, গ্রহ-চন্দ্র-তারায়? জীবনদেবতা বিশেষ ভাবে জীবনের আসনে, হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁর পীঠস্থান, সকল অনুভূতি সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। বাউল তাঁকেই বলেচে মনের মানুষ। এই মনের মানুষ, এই সর্ব মানুষের জীবনদেবতার কথা বলার চেষ্টা করেচি 'Religion of man' বক্তৃতাগুলিতে।"[৮]

বাউলতত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা ও বাউলদের মনের মধ্যে যে ঐক্যের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন, তাঁর প্রভাব পরিণত বয়সের রচিত গানগুলিতেও এক নতুন রূপে আমরা পাই। রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনে বাউলদের প্রভাব সম্পর্কে নিজে বলেছেন-

"আমার লেখা যারা পড়েছেন, তাঁরা জানেন, বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি। শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউল দলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হত। আমার অনেক গানেই আমি বাউল সুর গ্রহণ করেছি; এবং অনেক গানে অন্য রাগরাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল

সুরের মিল ঘটেচে। এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী কোন এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে।... 'অন্তরতর যদয়মাত্মা' উপনিষদের এই বাণী এদের মুখে যখন 'মনের-মানুষ' বলে শুনলুম, আমার মনে বড় বিস্ময় লেগেছিল। এমন বাউল গান শুনেচি, ভাষার সরলতায়, ভাবের গভীরতায়, সুরের দরদে যার তুলনা মেলে না, তাতে যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব তেমনি কাব্য রচনা, তেমনি ভক্তিরস মিশেচে।..."[৯]

উপনিষদে আলোচিত হয় 'মানুষ ও ব্রহ্মাণ্ড' তথা 'আত্ম ও ব্রহ্ম' এর মধ্যে অস্তিত্বগত সম্পর্ক নিয়ে। ভারতীয় দর্শনে বিশেষ করে ভারতীয় বিশ্বতত্ত্বে 'আত্ম ও ব্রহ্ম' এর মধ্যে যে সাম্যের সম্পর্ক তা নিয়ে ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল। উপনিষদের প্রকৃত অর্থ 'সংযোগ' বা 'সাম্য'। সুতরাং উপনিষদ তার নামের মাধ্যমেই তার মূল দর্শন বর্ণনা দেয়, সেটি হচ্ছে 'আত্ম ও ব্রহ্ম' এক এবং অভিন্ন। রবীন্দ্রনাথও উপনিষদের এই তত্ত্বটি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন এবং এই আদর্শে প্রভাবিত ছিলেন। রবীন্দ্রকাব্যে *ক্ষণিকায়* দেখা যায় কবির রসবিদগ্ধ জীবনের অনুভূতিকে একটি অবস্থানে এনে উত্তীর্ণ করেছিলেন। ব্রহ্মধর্ম, বাউলতত্ত্ব, উপনিষদ সকল দর্শনই রবীন্দ্রনাথের 'ঈশ্বর ভাবনায়' বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। এই দর্শনগুলি তাঁকে ধারণ করতে শেখায় 'সর্বমানবের মধ্যে মিলন সাধন'। পৌষ উৎসবের একটি ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেন-

"মিলনের মধ্যেই সত্যের প্রকাশ, মিলনের মধ্যে যে সত্য তাহা কেবল বিজ্ঞান নহে,তাহা আনন্দ,তাহা রসস্বরূপ, তাহা প্রেম। তাহা আংশিক নহে, তাহা সমগ্র কারণ তাহা কেবল বুদ্ধিকে নহে, তাহা হৃদয়কেও পূর্ণ করে। ... তিনি নীরস সত্য নহেন, তিনি প্রেম। এই প্রেমই উৎসবের দেবতা- মিলনই তাঁহার সজীব সচেতন মন্দির।"[১০]

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় যে স্বদেশবোধ কবির জাগ্রত ছিল তার প্রভাব তাঁর এই ভাষণে ছিল। এসময়ও কবি 'বাউল' সুরে অনেকগুলি গান রচনা করেছিলেন। সকলের সঙ্গে এক হবার যে প্রত্যয়, তা তিনি সেই সময় সহজ বাউল সুরে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে পৌঁছে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর ভাবনার পরিণত রূপের একটি পর্ব *গীতাঞ্জলি*, *গীতালি* ও *গীতিমাল্য* রচনা। *'নৈবেদ্য ও গীতাঞ্জলি'র* মাঝে কবি রচনা করেছিলেন *খেয়া* কাব্য টি। এর প্রাসঙ্গিকতা হল এর পূর্বে ও পরে কবির ঈশ্বর ভাবনার দুটো রূপ পাওয়া যায়। *খেয়া* রচনার চার অথবা পাঁচ বছর পর *গীতাঞ্জলি* রচিত হয়। *'নৈবেদ্যে'র* পূর্বে রচিত ধর্মসংগীতগুলি অনেক জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু তা *গীতাঞ্জলির* গানের সাথে তুলনীয় নয়। *গীতাঞ্জলির* গানে ও কবিতায় কবির ঈশ্বরকে প্রিয়তম রূপে আমরা পাই। ধর্মবোধ বা ঈশ্বর ভাবনায় পূজা যে প্রেমে রূপান্তরিত হয় তা আমরা তাঁর রচনায় দেখতে পাই। আর দুই পর্বের মধ্যবর্তী *খেয়া* কাব্যে কবির ভাবনা এমন-

"আমার যাহা সর্বশ্রেষ্ঠ তাহা আমি ব্রহ্মকে সমর্পন করিলাম। এই সমর্পনের পর মনে কোনো খেদ নাই, অভিমান নাই। 'সোনার তরী'র মধ্যেও এই কথাটি আছে অন্যভাবে। সেখানে মহাকাল আমার সর্বস্ব নিয়ে যায় বটে, কিন্তু আমাকে ফেলিয়া যায় বিস্মৃতি ও অবহেলার মধ্যে। সেখানে সোনার তরীর নেয়ে আমার সোনার ধান নিয়ে যায় খেয়াপারে, কিন্তু আমাকে নেয় না। আর *'খেয়া'র* নেয়ে মানুষকে অসহায় ভাবে ফেলে যায় না। কবির দিক হইতেও ব্যর্থতার জন্য ক্ষোভ

নাই, তিনি বলেন 'আমার নাইবা হল পারে যাওয়া'। কারণ কবির কাছে পার-অপার দুই-ই রূপ অরূপের ন্যায় সত্য, অচ্ছেদ্যবন্ধনে তাদের মিলন সম্পূর্ণ। পারাপার পরিপূর্ণ, অখণ্ড ও অশেষ।"[১১]

ধর্মের একত্ব ও সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে কবির যে মত বা জ্ঞান এতদিন উপনিষদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল তা সংকীর্ণতা ত্যাগ করে বিচিত্র 'ধর্ম ও মতের' উদার ভূমিতে এসে পড়েছে। ঈশ্বর যে কোন সম্প্রদায়ের নয় তা স্পষ্টতর হচ্ছে এভাবে-

"নৈবেদ্যের দেবতা দূরে থাকিয়া পূজার্ঘ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, 'খেয়ার নেয়ে' আলোছায়ার রহস্যলোকে অস্পষ্টভাবে ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিয়েছেন, আর গীতাঞ্জলির দেবতা ভক্তের সম্মুখে আসেন। শান্তিনিকেতনের ধ্যানলব্ধ সাধনার মধ্যে গীতাঞ্জলির রসানুভূতির প্রতিষ্ঠা। কবির এই রসের ধর্ম গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য ও গীতালিতে স্তরে স্তরে গভীর হইতে গভীরে গিয়া পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।... শারোৎসব, অচলায়তন, রাজা, ডাকঘর, নাটকচতুষ্টয় এই পর্বেরই রচনা। এইসব নাটকের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক সংগ্রামের চিত্র কবি ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই অবচেতন মনের সংগ্রাম।"[১২]

পৃথিবীতে সাধকদের যথার্থ সাধনা হচ্ছে 'প্রেম'। রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনার মূল কথা 'প্রেমতত্ত্ব'। তাঁর কাব্যসাধনা এই প্রেমের বিচিত্র অনুভূতিকে আশ্রয় করে, তাঁর কর্মযোগেও এই প্রেমের প্রকাশ। বিশ্বসংসারে রসবস্তু, 'প্রেম-বিরহ-মিলন' আছে বলেই জগৎ জীবন্ত গতিশীল ও সুন্দর। কবি তাঁর সর্ব ইন্দ্রিয় দিয়ে বিশ্বের সব উপাদানকে সম্ভোগ করেন, এটিই কবির ধর্ম। এই 'ধর্ম' কে কবি ধর্মাদর্শ বলে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন-

"এই প্রকাণ্ড বিপুল বিশ্ব-গানের বন্যা যখন সমস্ত আকাশ ছাপিয়ে আমাদের চিত্তের অভিমুখে ছুটে আসে তখন তাকে এক পথ দিয়ে গ্রহণ করাতেই পারি নে, নানা দ্বার খুলে দিতে হয় চোখ দিয়ে, কান দিয়ে, স্পর্শেন্দ্রিয় দিয়ে, নানা দিক দিয়ে তাকে নানারকম করে নিই। এই একতান মহাসংগীতকে আমরা দেখি, শুনি, ছুঁই, শুঁকি, আস্বাদন করি।"[১৩]

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম হল পরিপূর্ণ মানবতার ধর্ম। জ্ঞান, প্রেম ও শক্তি বা কর্মের পরিপূর্ণ মিলনেই পূর্ণ আনন্দ। সৃষ্টিকর্তা মানুষের মনে স্বাধীন ইচ্ছা দিয়ে সেই ইচ্ছাকেই পুনরায় প্রেমরূপে দাবি করেন, যা ধর্মতত্ত্বের একটি আশ্চর্য বিষয়। ঈশ্বর কখনও মহাভিক্ষুক রূপে আমাদের কাছে সবকিছু চাইছেন আবার তিনি রাজরাজেশ্বর বেশে আমাদের তাঁর অংশীদার হবার জন্য আহ্বান করেছেন। অধ্যাত্মজীবনের এই পরম আকুতিই প্রেমে অধিকার, এ যেন ঈশ্বরেরই দান। রবীন্দ্রনাথের গানে এই ভাবের গান প্রকাশ পাই তাঁর *গীতাঞ্জলির* গানে-

তাই তোমার আনন্দ আমার'পর
তুমি তাই এসেছ নীচে-
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হত যে মিছে ॥...
...মোর জীবনে বিচিত্ররূপ ধরে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে ॥...

রবীন্দ্রনাথের যথার্থ আধ্যাত্মিক সঙ্গীতের সূত্রপাত *গীতাঞ্জলি* পর্ব থেকে সূচনা হয়েছে। এই গানগুলিতে 'ঈশ্বর ও প্রকৃতি' এবং সেই সঙ্গে মানব অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। কবিগুরু ঈশ্বর আরাধনায় যে 'মুক্তির' কথা বলেছেন তা হল প্রেমের মধ্য দিয়ে 'মুক্তি'। তিনি বলেন-

"তুমি মনে কোরো না প্রতিমা-পূজা ছাড়া প্রেম হতেই পারে না-যদি সুফীদের প্রেমের সাধনার বিবরণ পড়ে থাক তবে দেখবে তাঁরা কী আশ্চর্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঙ্গে কী অপরিসীম প্রেমের মিলন সাধন করিয়েছেন। তাঁদের সেই প্রেম কেবল একটা শূণ্য ভাবের জিনিস নয়, তা অত্যন্ত নিকট, অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, অত্যন্ত অন্তরঙ্গ অথচ তার সঙ্গে কোনোপ্রকার কাল্পনিক জঞ্জালের আবর্জনা নেই।"[১৪]

রবীন্দ্রনাথ এখানে প্রেমের মুক্তির কথা বলেছেন এই জন্য যে, তিনি কল্পনাকে, হৃদয়কে, বুদ্ধিকে, কর্মকে কেবলই 'মুক্তির' অভিমুখে আকর্ষণের কথা বলেছেন। তিনি নিজের জন্য ও দেশের জন্য সেই মুক্তি চেয়েছেন যা প্রেমের 'মুক্তি'। তিনি তাঁর জীবনবোধ কিংবা জীবনদৃষ্টি দিয়ে যাই অনুভব করেছেন, তার সফল প্রকাশ ঘটিয়েছেন গানের মধ্যে দিয়ে। এই অনুভূতি তিনি গানের ভাষায় প্রকাশ করেছেন এভাবে-

গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি
তখন তারে চিনি আমি, তখন তারে জানি ॥
... রুপের রেখা রসের ধারায় আপন সীমা কোথায় হারায়,
তখন দেখি আমার সাথে সবার কানাকানি ॥

মানব, প্রকৃতি সমস্তই পূর্ণতায় আভাসিত হয়ে নবরূপে কবির চোখে পড়ে। কবি ঈশ্বরের যে স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন তার বৈশিষ্ট্যগুলি এমন-

"কবি সীমার কোটি হইতে দৃষ্ট হইলেও যেমনি সত্য, অসীমের কোটি হইতে দৃষ্ট হইলেও তেমনি সত্য আবার সীমা ও অসীমের মিলিত কোটি হইতে দৃষ্ট হইলেও তেমনি সত্য।"[১৫]

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের একমাত্র পালাই হল সীমার মধ্যেই অসীমের মিলন সাধনার চেষ্টা। প্রমথনাথ বিশী তাঁর গ্রন্থে খুব সুন্দর করে উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বুঝিয়েছেন এভাবে-

"সীমার কোটি হইতে কবি যখন ভগবানকে দেখিয়েছেন তখন তাঁহাকে নিতান্ত ঘরের মানুষ বলিয়া, মানুষের প্রেমভিক্ষু বলে মনে হইয়াছে-

তব সিংহাসনের আসন হতে
এলে তুমি নেমে
মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে
দাঁড়ালে নাথ থেমে

[৫৬ সংখ্যক গীতাঞ্জলি]

সীমারূপে, আপনরূপে জানিলে সাধকের গর্বের অন্ত থাকে না, সে অকুতোভয়ে বলে-

তাই তোমার আনন্দ আমার পর,
তুমি তাই এসেছ নীচে।
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হতো যে মিছে।

[১২১, সংখ্যক, গীতাঞ্জলি]

তখন আর সন্দেহ থাকে না যে-

আমার মিলন লাগি তুমি
আসছ কবে থেকে।
তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায়
রাখবে কোথায় ঢেকে

[৩৯ সংখ্যাক, গীতাঞ্জলি]

তখন এতবড়ো বিশ্বব্যাপারটা কেবল দুজনের মিলনের জন্যই সুসজ্জিত মনে হয়-

তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
আলোয় আকাশ ভরা,
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
ফুল্ল শ্যামল ধরা।

[৫২ সংখ্যক, গীতাঞ্জলি]

তখন নিতান্ত সীমাবদ্ধরূপে পাইতে সাধকের বড়ো আকিঞ্চন-

হাতখানি ওই বাড়িয়ে আনো,
দাওগো আমার হাতে,
ধরবো তারে, ভরবো তারে
রাখবো তারে সাথে।

[২৫ সংখ্যক, গীতালি]

তখন মিলনের মুহূর্ত অবহেলায় গত হইল বলিয়া নিদ্রা বিস্মৃত হইতে থাকে-

ও আমার মন যখন জাগলি নারে-
তোর মনের মানুষ এল দ্বারে
তার চলে যাবার শব্দ শুনে
ভাঙল রে ঘুম অন্ধকারে

[২৭ সংখ্যক, গীতালি]

এই ঘরের মানুষ, কাছের মানুষ চিরকালের মানুষও বটেন-

তোরা শুনিসনি কি শুনিসনি তার পায়ের ধ্বনি

সে যে আসে আসে আসে।

যুগে যুগে পলে দিনরজনী।

সে যে আসে আসে আসে।

[৬২ সংখ্যক, গীতাঞ্জলি]

আবার তিনি যখন অসীমের কোটি হইতে দৃষ্ট তখন তাঁহার এক রূপ-

হেরি অহরহ তোমারি বিরহ

ভুবনে ভুবনে রাজে হে।

কত রূপ ধরে কাননে ভূধরে

আকাশে সাগরে সাজে হে।

[২৫ সংখ্যক, গীতাঞ্জলি]

তখন ওই কাছের মানুষটির বিশ্বব্যাপী বিভূতি প্রকাশিত হইয়া পড়ে-

তোমার চরণ পানে নয়ন করি নত

ভুবন দাঁড়িয়ে আছে একান্ত।

[৬৮ সংখ্যক, গীতাঞ্জলি]

সীমারূপে যিনি বন্ধু, অসীমরূপে তিনি নির্বিকল্প নন, অসীমরূপের প্রেমটির জন্যও কবির সমান আকাঙ্ক্ষা। কেননা, দুটি রূপেই তিনি সত্য; যিনি পূর্ণ-কোন্ রূপে তাঁর অপূর্ণতা? যিনি প্রেমময়-কোন্ রূপে তাঁর প্রেমের অভাব? একসঙ্গে তিনি সীমা ও অসীম-

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি

বাজাও আপন সুর।

আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ

তাই এত মধুর।

কত বর্ণে কত গন্ধে

কত গানে কত ছন্দে,

অরূপ, তোমার রূপের লীলায়

জাগে হৃদয়পুর।"[১৬]

[১২০ সংখ্যক, গীতাঞ্জলি]

এই সময়ের ঈশ্বর ভাবনায় কবির জন্মজন্মান্তরে প্রেম সম্পর্ক। ঈশ্বরের সাথে ভক্তের যে লীলা তা *গীতাঞ্জলি*, *গীতিমাল্য এবং গীতালির* যুগ থেকেই কবির আধ্যাত্ম ভাবনায় প্রবেশ করেছে। পূজাপর্যায়ের অনেক গানেই ঈশ্বরের সঙ্গে কবির এই লীলায়িত সম্পর্ক প্রকাশ পায়। ঈশ্বরের কাছে কবি যখন কিছু চান তখন ঈশ্বরের দানটি

ক্ষণস্থায়ী হয়। অপর পক্ষে ঈশ্বর যখন ভক্তের কাছে কিছু চাইতে আসেন, তখন কবির নিজস্ব ভান্ডার অপার্থিব সম্পদে পূর্ণ হয়ে ওঠে। এমনি ভাব সম্পন্ন একটি গান-

আমি যখন তাঁর দুয়ারে ভিক্ষা নিতে চাই
তখন যাহা পাই-
সে যে আমি হারাই বারে বারে ॥
তিনি যখন ভিক্ষা নিতে আসেন আমার দ্বারে
বন্ধ তালা ভেঙে দেখি আপন-মাঝে গোপন রতনভার
হারায় না সে আর ॥...

রবীন্দ্রনাথ লীলাবাদী ছিলেন বলে ঈশ্বরের সাথে মানুষের লীলার সম্পর্কে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন। এই বিশ্বাসের মরমী ধর্মাচার্যদের প্রভাব ছিল। যেমন-

"ঈশ্বরকে তাঁরা অনুভব করেছিলেন জীবনের সর্বক্ষেত্রে। মানবতাই তাঁদের ধর্মের মূল আদর্শ। দেহের সহজাত প্রবৃত্তিকে স্বীকার করে নিয়েও আত্মাকে চৈতন্যমুখী ঈশ্বরচেতন করে তোলা যায়, ... সাধক কবি মীরাবাঈ তুকারাম নানক দাদু প্রভৃতি সাধকদের গানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটেছিল গীতাঞ্জলি পর্বে।"[১৭]

তিনি আরও বলেন-

"আমারই ভিতর সমস্ত বিশ্ব পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, আমারই জীবনের মধ্যে সমস্ত বিশ্বসৌন্দর্য অবাধে ফুটিতেছ, তাঁহাদের গান এই আনন্দের সুরে বাঁধা। '-য়াঘট ভীতর চন্দ্র সূরহৈঁ য়াহী মে নৌলখ তারা'-'আমারই মধ্যে চন্দ্রসূর্য, আমারই মধ্যে তারা প্রকাশিত।- কবীর

আজি যত তারা তব আকাশে
সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে। রবীন্দ্রনাথ।

যাবহী মূরত বীচ অমূরত মূরতকী বলিহারী- সকল মূর্তিরই মধ্যে অর্মূত; বলিহারি যাই সকল মুর্তির। কবীর

রূপসাগরে ডুব গিয়েছি অরুপরতন আশা করি। - রবীন্দ্রনাথ

এই রূপে দেখা যাইবে যে ইহাদের গানের ভিতরকার তত্ত্বটাই এই যে। বিশ্বকে কোথাও বাদ দেওয়া নয়। রূপকে কোথাও অস্বীকার করা নয়, কিন্তু আত্মার আনন্দের দ্বারা সমস্তকে পূর্ণ করিয়া গ্রহণ কর। আশ্চর্য ইহাদের উপলব্ধি, পরিপূর্ণ ইহাদের আনন্দোদ্‌বোধন এবং রসানুভূতি"[১৮]

বর্তমান যুগে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি সকলের মুখে মুখে থাকবার কারণ তাঁর রচনায় নিজস্বতা। তিনি অনেক তত্ত্ব কিংবা ব্যক্তিদ্বারা প্রভাবিত হলেও তাঁর সৃষ্টির যে স্বকীয়তা তা কারো সাথে তুলনীয় নয়। তাঁর 'পূজা ও প্রেম' পর্যায়ের গানেও আমরা এই নিজস্বতা খুঁজে পাই। ঈশ্বর আরাধনায় কবি, বিজন ঘরে নিশীথ রাতে ঈশ্বরের আগমনকে খুঁজে পেয়েছেন। সংশয়-বেদনা, প্রত্যাশা-ব্যর্থতা, বিরহমিলন এবং মৃত্যু ভাবনা সকলই প্রকাশ পেয়েছে। পরিণত বয়সে ঈশ্বরাধনার শেষ পর্বে তিনি প্রশান্তির সঙ্গীত গেয়েছেন। জীবন মরণের সীমানা ছাড়িয়ে ঈশ্বরকে বন্ধুরূপে পেয়েছেন। সকল অন্ধকার দূর করে প্রেমময় দ্যুতি দেখতে চেয়েছেন। তিনি তাঁর জীবনের

সম্মুখের যে শান্তির পারাবার দেখতে পেয়েছিলেন, সেই মহাপারাবারে তিনি পৃথিবীর সকল বন্ধনমুক্ত কবি অসীমের আনন্দ চেতনায় সীমার মুক্তি বারংবার ঘটাতে চেয়েছেন। পূজাপর্যায়ের গানের ভাবপ্রকাশে তিনি উপনিষদ থেকে ভারতীয় সাধনার বিভিন্ন ধারা, সত্য-শিব-সুন্দরের আদর্শ, সুফীধর্মে ঈশ্বরকে প্রেমিকরূপে কল্পনা, মরমী সাধকদের দেহ সচেতন আধ্যাত্মিক অনুভূতি, বৈষ্ণবীয় অভিসার সকল প্রকার ভক্তিভাবকে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এক অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েছেন, তা হল- তিনি প্রেমের কবি, প্রকৃতিরও কবি, মাববতার প্রবক্তা। ফলে প্রেম, প্রকৃতি, মানব ও ঈশ্বর এই চারটি বিষয় তাকে তাঁর কবিচিত্তে ও রচনায় এক অনন্য অনুভূতির সৃষ্টি করেছিল। যার ফলে ফলাফল হিসেবে আমরা পাই 'পূজা ও প্রেম' একত্রে মিশে এক অন্যরকম অনুভূতির।

যেমন: পূজাপর্যায়ের একটি গান-

আজি বিজন ঘরে নিশীথরাতে
আসবে যদি শূণ্য হাতে-
আমি তাইতে কি ভয় মানি!
জানি জানি, বন্ধু, জানি-
তোমার আছে তো হাতখানি ॥

গানটির পর্যায় জানা না থাকলে মনে হয় গানটি প্রেমপর্যায়ের গান। কিন্তু এখানে কবির ঈশ্বর বিজন ঘরে শূন্য হাত নিয়ে এসেছেন তার পরও কবি সন্তুষ্ট। কারণ, সে হাত তাঁর বন্ধুরই হাত।

আবার, আরেকটি গান-

কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারই ঘায়ে-
নিবিড় বেদনাতে পুলক লাগে গায়ে ॥
তোমার অভিসারে যাব অগম-পারে
চলিতে পথে পথে বাজুক ব্যথা পায়ে ॥...

ঈশ্বরের উপস্থিতি যখন নিজের অন্তরে অনুধাবন হয় এবং তা বিশ্বপ্রকৃতিতেও লক্ষ করা যায়, তখনই যেন সাধক ঘর থেকে অভ্যস্ত জীবন ছেড়ে বেড়িয়ে পড়ে। আর এখানেই শুরু হয় অভিসার-যাত্রার। সেই যাত্রা কখনও 'ঈশ্বরের জন্য মানবের' এবং কখনও 'মানবের জন্য ঈশ্বরের'। উল্লেখিত গানটি প্রেমপর্যায়ের মনে হলেও এটি পূজাপর্যায়ের গান। যেখানে পূজা প্রেমে রূপান্তরিত হয়েছে। আবার প্রেমের গান পূজায় রূপান্তরিত হয়। কারণ, প্রেমের গান বলতে আমরা প্রথমেই নর ও নারীর পারস্পরিক আকর্ষণ, মিলন, বিরহ ইত্যাদিকে বুঝি। এর মধ্যে ত্যাগ বা দেওয়ার প্রসঙ্গ প্রধান হলে তাকে বলি 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা'র বিকল্প। যেখানে আত্মসুখের চেয়ে প্রিয়কে সুখী করাই প্রধান উদ্দেশ্য। *গীতবিতানে* অনেক সময় মনে হয় 'প্রেমের' এই সংজ্ঞাকে গ্রহণ করা

হয়েছে। ফলে প্রেমপর্যায়ের অনেক উল্লেখযোগ্য গান 'পূজা' পর্যায়ের সমধর্মী হয়ে উঠে। 'পূজা ও প্রেম' যে স্বতন্ত্র করা যায় না। যেমন, প্রেমপর্যায়ের একটি গান-

দীপ নিবে গেছে মম নিশীথসমীরে,
ধীরে ধীরে এসে তুমি যেয়ো না গো ফিরে ॥...
...ভয় পাছে শেষ রাতে ঘুম আসে আঁখিপাতে
ক্লান্ত কণ্ঠে মোর সুর ফুরায় যদি রে ॥

ঈশ্বর, মানব ও প্রকৃতি সমপর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছে এমন গানের কিছু উদাহরণ-

- তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা

  [প্রেম পূজায় রূপান্তর]

- কোথা হতে বাজে প্রেমবেদনা রে

  [পূজা প্রেমে রূপান্তর]

- যে রাতে মোর দুয়ারগুলি

  [পূজা প্রেমে রূপান্তর]

- আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা

  [প্রেম পূজায় রূপান্তর]

- তুমি তো সেই যাবেই চ'লে

  [প্রেম ও প্রকৃতি, পূজায় রূপান্তর]

- আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার

  [প্রকৃতি, পূজা ও প্রেমে রূপান্তর]

- কেন যামিনী না যেতে জাগালে না

  [একই সঙ্গে প্রেম ও পূজার গান]

বিভিন্ন পর্যায় নির্বিশেষে সবগানেই মিলনের আভাস আছে, আছে অভিসারের কথাও। এই অভিসার ঈশ্বর না মানব তা একান্ত শ্রোতার মানসিক চাহিদার উপর নির্ভর করে। আর এখানেই রবীন্দ্রনাথের অনন্যতা। সীমার মাঝে যেমন অসীম প্রকাশিত, তেমনি নারীর মধ্যে মধ্য দিয়েও অরূপ সৌন্দর্য মূর্ত হয়। পূজার গানে যেমন ভূমির অন্তরালবর্তী ভূমাকে দেখা যায়, কবিতায় 'রূপের পদ্মে অরূপমধু' আস্বাদন সম্ভব হয়। তেমনি, নারীর রূপের কোলে ওই যে দোলে 'অরূপ মাধুরী'। প্রেমের আলম্বনে নারী যেমন ভূমিকা রাখে, তেমনি প্রেমের উদ্দীপনে প্রকৃতির ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। এমনি একটি প্রেমপর্যায়ের গান-

... উতলা হয়েছে মালতীর লতা,
ফুরালো না তাহার মনের কথা।
বনে বনে আজি একি কানাকানি
কিসের বারতা ওরা পেয়েছে না জানি,
কাঁপন লাগে দিগঙ্গনার বুকের আঁচলে-
সে আসিবে আমার মন বলে ॥

প্রকৃতি নানা ইঙ্গিত প্রকাশ করে। প্রকৃতি ও নারী এখানে হয় পরস্পরের সহোদরা। মানুষের মনে মূলত একটাই অনুভূতি, আর এই অনুভূতির দু'টি রূপ, যাকে আমরা কখনো 'ভক্তি' বলি, কখনো বলি 'প্রেম'। তাইতো ভাববাদী ভাবনায় বলে- 'আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ, চুনী উঠল রাঙা হয়ে'। এই ভাবনাটা রবীন্দ্রনাথের গানে 'প্রেম ও পূজা' যে পরস্পর মিলে মিশে একাকার, তা পাঠকের 'চেতনার রঙে' প্রেম পূজায় উন্নীত হয় বলেই বোধহয় বলা সম্ভব- 'যাহা দিই প্রিয়রে, তাই দেই দেবতারে।'

পূজাপর্যায়ের প্রথম গানটির মধদিয়েই যেন কবি তাঁর সঙ্গীত সাধনার মর্মকথাটি ব্যক্ত করেছেন-

কান্না হাসির দোল দোলানো
পৌষ-ফাগুনের পালা,
তারি মধ্যে চিরজীবন বইব গানের ডালা
এই কি তোমার খুশি, আমায় তাই পরারে মালা
সুরের-গন্ধ-ঢালা ?।...

তথ্যসূত্র

১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড*, প্রকাশনা : বিশ্বভারতী, প্রকাশকাল : বৈশাখ ১৪২৪, পৃ. ৩৮

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

৩. করুণাময় গোস্বামী, *রবীন্দ্রসংগীতকলা ২য় খণ্ড*, প্রকাশনা : বাংলা একাডেমী, প্রকাশকাল : জুন ২০১২, পৃ. ১১২

৪. ড. অরুণকুমার বসু, *বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত*, প্রকাশনা : দে'জ পাবলিশিং, প্রকাশকাল : আগস্ট ১৯৯৪, পৃ. ১৩২

৫. স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়, *সমকালের বাংলাগান ও রবীন্দ্রসঙ্গীত*, প্রকাশনা : প্যাপিরাস, প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২, পৃ. ১৮

৬. ড. অরুণকুমার বসু, *বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত*, প্রকাশনা : দে'জ পাবলিশিং, প্রকাশকাল : আগস্ট ১৯৯৪, পৃ. ৪৯০

৭. করুণাময় গোস্বামী, *রবীন্দ্রসংগীতকলা ২য় খণ্ড*, প্রকাশনা : বাংলা একাডেমী, প্রকাশকাল : জুন ২০১২, পৃ. ১১৫

৮. শান্তিদেব ঘোষ, *রবীন্দ্রসংগীত বিচিত্রা*, প্রকাশনা : আনন্দ পাবলিশার্স, প্রকাশকাল : এপ্রিল ১৯৯৭, পৃ. ৯৭

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী ৭ম খণ্ড*, প্রকাশনা : বিশ্বভারতী গ্রন্থণ বিভাগ, প্রকাশকাল : পৌষ ১৪০২, পৃ. ৪৪৯

১১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী ২য় খণ্ড*, প্রকাশনা : বিশ্বভারতী, প্রকাশকাল : মাঘ ১৪২৩, পৃ. ১৮৯

১২. প্রাগুক্ত,পৃ. ২৪৫

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫

১৫. প্রমথনাথ বিশী, *রবীন্দ্র সরণী*, প্রকাশনা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০১৩, পৃ. ১২৫

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬-১২৮

১৭. ড. অরুণকুমার বসু, *বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত*, প্রকাশনা : দে'জ পাবলিশিং, প্রকাশকাল : আগস্ট ১৯৯৪, পৃ. ৫১৬

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৬, ৫১৭

তৃতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান : বাণী ও সুর

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একাধারে গীতিকার ও সুরকার। কথা ও সুরের যুগলমিলনে তাঁর রচিত সঙ্গীত আজও বাঙালির অন্তরে এক বিশেষ স্থান করে আছে। বাঙালির সুখে, দুঃখে, প্রার্থনায়, প্রকৃতিতে, উৎসবে ইত্যাদিতে রবীন্দ্রনাথের গান মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আসছে। রবীন্দ্রনাথের গানের বাণী ও সুর যেন আমাদের অন্তরের নিজস্ব বাণী ও সুর হয়ে উঠেছে। প্রেমিক-প্রেমিকার না বলা কথা, দুঃখবোধ সবকিছুতেই কবির গানের বাণী যেন এক আত্মতৃপ্তি জোগায় পাঠক ও শ্রোতার নিকট। কবিগুরু এতোটাই আধুনিক যে তাঁর গানের বাণী ও সুর বর্তমান প্রজন্মের শ্রোতা, শিক্ষার্থী সকলের আগ্রহের বিষয় হয়ে আছে।

কেন রবীন্দ্রনাথের গান আজও আমাদের মনে স্থান করে নেয়? এই প্রশ্নটি মনে আসলে মনে হয়, তাঁর জীবনবোধ ও গভীর অন্তরদৃষ্টির মিশ্রণে গানের 'বাণী ও সুরে' এক পরিমিত যুগল-মিলন ঘটেছে। সঙ্গীত চিরকালের, প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ সুরের সাথে পরিচিত। সঙ্গীতের বারোটি স্বরের মিশ্রণে যুগ যুগ ধরে সুরের সাথে কথা বসিয়ে সঙ্গীত সৃষ্টি হয়ে আসছে। তার মধ্যে সেগুলোই সার্থক সঙ্গীত যেগুলো মানুষ চিরকাল মনে রাখে। কথার সঙ্গে সুরের মিলনে যে সঙ্গীত সেখানে শব্দের একটা নিজস্ব শিল্প আছে এবং ছন্দ তার প্রধান সহায়ক। তবে মনে রাখতে হবে শুধু শব্দ দিয়েই গান রচিত হয় না 'ছন্দ' গানেরও। যুগে যুগে মানুষ যেমন গানকে চেয়েছে তেমনি কাব্যকেও। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে বাক্য আমরা ব্যবহার করে আমাদের মনের আবেগগুলি প্রকাশ করি, সেই দুঃখ, সুখ, আনন্দ ও কান্নারও একটি সুর আছে। মনের ভাব প্রকাশ শুধু কথা দিয়েই হয় না। ভাষায় সবটা বলার শেষ না, এর সাথে যদি সুর যুক্ত হয় তাহলে বিমূর্ত (Abstract) আবেগ প্রকাশ করতে পারে। শুধু কাব্যে প্রিয়জনকে কথাটা বলতে গেলে তা একটি নিরস অর্থ প্রকাশ করে। সুতরাং বলতে পারি, কাব্য নিজে একটি অর্থ প্রকাশ করে এবং কাব্যের সাথে সঠিক সুর যোজনায় তা গান হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবদ্দশায় রচিত সব গানের কথা *গীতবিতানে* ভাবানুসারে পর্যায় বিভাগ করে এবং সুরগুলিকে স্বরলিপিকারে প্রকাশ করে গেছেন। ফলে গায়ক, শিক্ষক বা শিক্ষার্থীর বিশেষ কোন সুযোগ নাই তা পরিবর্তন করার। কবির পরিমিতিবোধ এতটাই প্রখর যে- সকল বিষয়ের গানের 'কথা ও সুর' এতোটাই পারস্পরিকভাবে জড়িত, রসবোধ বৃদ্ধির জন্য তাতে অতিরিক্ত অলংকরণের কোনো প্রয়োজন নেই। কবি নিজেও উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের অতিরিক্ত বাহুল্য নিজের গানের সাথে যুক্ত করা পছন্দ করতেন না। কবি ও দীলিপকুমার রায়ের পত্রালাপে তা আরও স্পষ্ট হবে-

"আমি (দীলিপকুমার রায়) গানের প্রসঙ্গে ফিরে আসার জন্য বললাম ... মতভেদ কিছুই নেই। আমি কেবল আপনার গানের সুরে একটা অনড় রূপ বজায় রাখার বিরোধী। আমি বলি গায়ককে আপনার গানের সুরের (variation) করবার

স্বাধীনতা দিতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'এইখানেই তোমার সঙ্গে আমার মতভেদ। আমি যে গান তৈরি করেছি তার ধারার সঙ্গে হিন্দুস্থানী সংগীতের ধারার একটা মূলগত প্রভেদ আছে'... কেন স্বীকার করবে না যে, হিন্দুস্থানী সংগীতে সুর মুক্ত পুরুষভাবে আপনার মহিমা প্রকাশ করে, কথাকে শরিক বলে মানতে সে যে নারাজ... বাংলায় সুর কথাকে খোঁজে, চিরকুমারব্রত নয়, তার সে যুগলমিলনের পক্ষপাতী।"[১]

কবিগুরু নিজেই তাঁর গানের বিকৃত রূপ দেখে গিয়েছিলেন এবং দুঃখ পেয়েছেন। সেই দুঃখকে চিরস্থায়ী না করবার জন্যই তিনি তাঁর নিজের গানের 'বাণী ও সুরের' পরিবর্তনের প্রতি নিষেধাজ্ঞা দিয়ে গেছেন। বর্তমান যুগে আমরা দেখতে পাই কিছু মানুষের চেষ্টা কবির গানের কথা ও সুরের পরিবর্তন করে গাওয়ার এ চেষ্টা সাময়িক এক শ্রেণির শ্রোতার কাছে সুখবোধ হলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না, বা মানুষ মনে রাখে না। রবীন্দ্রনাথ একটা কথা বিশ্বাস করতেন, যে হিন্দুস্থানী গান ভালো করে শিখবে, তার প্রভাবে বাংলা সঙ্গীতে আরো এক নতুন সৌন্দর্য আসবে এবং এটাই স্বাভাবিক। তিনি মনে করতেন বাংলার বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে যদি হিন্দুস্থানী গান থেকে নূতন সৌন্দর্য গ্রহণ করা যায় তাহলে সেটা এক ভিন্ন রূপ নিবে। তবে এ চেষ্টা করার মানুষ কোথায়? হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে দক্ষ হয়ে পরিমিতিবোধ মাথায় রেখে চেষ্টা করার প্রসঙ্গে দীলিপকুমারকে বলেন-

"তুমি হিন্দুস্থানী সংগীত assimilate ক'রে বাংলার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য সাধন করতে পার, তাহলে তুমি সাগরের মতনই সুরের সুরধুনী বইয়ে দিতে পারবে-নইলে সুরের জলপ্লাবনই হবে, কিন্তু তাতে তৃষিতের তৃষ্ণা মিটবে না।"[২]

বর্তমান যুগে তাঁর গান নিয়ে যেন, জলপ্লাবনেরই চেষ্টা চলছে। যারা রবীন্দ্রনাথের গানের একনিষ্ঠ ভক্ত তাঁদের তৃষ্ণা এসব পরিবর্তনে মেটে না। সেই শ্রোতারা বরাবরই খোঁজে কবির নিজস্ব 'কথা ও সুরের' যুগলমিলনের গান। রবীন্দ্রনাথ সাধনার পথ হিসাবে প্রাচীন ব্রহ্মবাদী সঙ্গীতের পথ অনুসরণ করেছিলেন এবং তিনি তাঁদের মতই সঙ্গীতেই মুক্তি খুঁজেছিলেন। তাঁর রচনার জগৎ মূলত বিচিত্র ও গভীর বেদনার প্রকাশ। তিনি ছিলেন উচ্চতর মরমী সাধক। মৃত্যুর গভীর বেদনায় মানুষকে আমরা যেমন কথা বসিয়ে কাঁদতে দেখি, তেমনি মানবীয় প্রেমের মধ্যেও যেখানে বিরহ-বেদনা, সেইখানেই কবির গান সবচেয়ে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

আমাদের মনের ভাব সুরে প্রকাশ করার জন্যই যেন সঙ্গীতের উৎপত্তি। সঙ্গীতে বিচিত্র ভাবের সমাহার আমরা পাই। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানেই দেখতে পাবো কত রকম ভাবে কবি তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানের সফলতা হলো তিনি গান রচনায় ভাবের সাথে অনুভাবকেও ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর জীবনে আমরা দেখতে পাই, জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাত ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা। যা কখনও মধুর আবার কখনও বিষাদময়। কৈশোর থেকে পরিণত বয়সে কবি তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতাগুলোকে গান রচনার অনুষঙ্গ হিসেবে

গ্রহণ করেছিলেন। প্রেমের গানগুলি শুধু তাঁর ব্যক্তিগত ভালোবাসা বা প্রেমিক-প্রেমিকার তথাকথিত রূপ হিসেবে রচনা করেননি। গানগুলোতে বয়স হিসেবে ভাবের পরিবর্তন ঘটেছে। কৈশোরের প্রেমের সাথীকে সে পরিণত বয়সে প্রকৃতিতে লীলাসঙ্গী হিসেবে খুঁজে পেয়েছেন। তিনি সঙ্গীতকে শুধুই বাইরের বিলাসের বস্তু হিসাবে দেখেননি। দেখেছিলেন সাধকের মতো ধ্যানের দৃষ্টিতে, সঙ্গীত রসের অত্যন্ত গভীরে প্রবেশ করে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রেমের গানের 'কথা ও সুর' শ্রোতা যে শুধু অনুভব করেন তা নয়। এ সঙ্গীত সাধারণ মানুষ অনায়াসে গ্রহণ করে এবং নিজের আনন্দ ও বেদনার সুরের সাথে মিলিয়ে নেয়। যার ফলে বন্ধুত্ব, প্রেম, পারিবারিক সুখ সমস্তই যেন একাত্মতা পায় কবির রচনায়। রবীন্দ্রনাথ *সংগীত ও ভাব* প্রবন্ধে বলেন-

"আমাদের দেশে সংগীত এমনি শাস্ত্রগত, ব্যাকরণগত, অনুষ্ঠানগত হইয়া পড়িয়াছে, স্বাভাবিকতা হইতে এত দূরে চলিয়া গিয়াছে যে, অনুভাবের সহিত সংগীতের বিচ্ছেদ হইয়াছে...। সংগীত একটি মৃত্তিকাময়ী প্রতিমা হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে হৃদয় নাই, প্রাণ নাই।... সংগীতে এতখানি প্রাণ থাকা চাই, যাহাতে সে সমাজের বয়সের সহিত বাড়িতে থাকে, সমাজের পরিবর্তনের সহিত পরিবর্তিত হইতে থাকে, সমাজের উপর নিজের প্রভাব বিস্তৃত করিতে পারে ও তাহার উপরে সমাজের প্রভাব প্রযুক্ত হয়।"[৩]

কবিগুরু গানের কথায় তাঁর মনের গভীর অনুভূতিগুলোকে প্রকাশ করেছেন। আর এই কথাগুলো বাঙালির যেন অন্তরের কথা হয়ে উঠেছে যুগযুগ ধরে। প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত পত্রে তিনি বলেন-

"...গান লিখি তা ভালো কি মন্দ সে কথা ভাববার সময় নেই। যদি বল তবে ছাপাই কেন, তার কারণ হচ্ছে এগুলি আমার একান্তই অন্তরের কথা- অতএব কারও- না কারও অন্তরের কোনো প্রয়োজন ওতে মিটতে পারে- ও গান যার গাবার সে একদিন গেয়ে ফেলে দিলেও ক্ষতি নেই, কেননা আমার যা দরকার তা হয়েছে।"[৪]

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র গান রচনায় কিছু গান আছে বাণীপ্রধান আবার কিছু আছে সুরপ্রধান। বাণীপ্রধান বলতে আমরা কাব্যসংগীত গুলিকেই বুঝি। সুরপ্রধান গান আমরা সেগুলোকেই বলি যে গানগুলি তিনি 'রাগসঙ্গীতের' প্রতি প্রভাবিত হয়ে রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাঙাগানগুলিও সুরপ্রধান গানের অংশবিশেষ, কারণ বিভিন্ন সময়ের নানান গানের সুর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি গানগুলি রচনা করেছেন।

'গীতবিতানে'র প্রেমপর্যায়ের তিনশত পচাঁনব্বইটি (৩৯৫) গান রয়েছে। গানগুলি দুইটি উপবিভাগে ভাবানুসারে পর্যায়ক্রমে সাজানো আছে। কালানুক্রমিক গানগুলোকে সাজালে দেখা যায় সতেরো (১৭) থেকে আটাত্তর (৭৮) বছর বয়সের মধ্যে তিনি গানগুলি রচনা করেছেন। পূর্বেই বলেছি তালিকাটি সুন্দর করে বোঝাবার জন্য ষোল বছর বয়স থেকে আটাত্তর বছর বয়স পর্যন্ত একুশ (২১) বছর অন্তর করে ভাগ করলে আমরা তিনটি পর্ব পাই। যা পূর্বের অধ্যায়ে তালিকারত আছে। পর্ব তিনটি হল-

প্রথম পর্ব : ১৬ (১৮৭৭) - ৩৬ (১৮৯৭)

দ্বিতীয় পর্ব : ৩৭ (১৮৯৮) - ৫৭ (১৯১৮)

তৃতীয় পর্ব : ৫৮ (১৯১৯) - ৭৮ (১৯৩৯)

প্রেমের গানের 'বাণী ও সুরের' বিশ্লেষণে এই পর্ববিভাগ অনুযায়ী করলে আমরা পাই-

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানের বাণী :

প্রেমের গানের প্রথম পর্বটির সময়কালে দেখতে পাই, রবীন্দ্রনাথের কৈশোরের প্রেমভাবনার প্রকাশ। একেবারেই ব্যক্তিচিত্তের ভাব ও ভাবনার, বেদনা ও আনন্দের গান, যেখানে কবি সুখের স্বপনে প্রাণ কাটানোর কথা বলেছেন। প্রিয়তমকে নিয়ে মনের খেলায় মেতে উঠতে চেয়েছেন। ১৮৭৮ সালে রচিত প্রেমের গানের বাণীতে বলেছেন-

দেখে যা, দেখে যা, দেখে যা লো তোরা সাধের কাননে মোর..
... এ কাননে বসি গাহিব গান, সুখের স্বপনে কাটাব প্রাণ,
খেলিব দুজনে মনের খেলা রে-
প্রাণে রহিবে মিশি দিবসনিশি, আধো-আধো ঘুমঘোর ॥

পরবর্তী বছরে সহচরীদের হাতে হাত ধরে গীতরবে উথলি সুরে মনপ্রাণ খুলবার কথা বলেছেন। ১৮৭৯ সালে রচিত গানে বলেছেন-

আয় তবে সহচরী, হাতে হাতে ধরি ধরি
নাচিবি ঘিরি ঘিরি, গাহিবি গান...
...উলসিত তটিনী
উথলিত গীতরবে খুলে দে রে মনপ্রাণ ॥

বালক রবীন্দ্রনাথের বৌঠান কাদম্বরী দেবীর সাথে ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ স্নেহের সম্পর্ক। বৌঠানের প্রভাব যেমন ছিল কৈশোরে, তেমনি শেষ জীবনের গানগুলিতেও বৌঠানের প্রভাব পাওয়া যায়। ১৮৮০ সালে মাত্র উনিশ বছরে তাঁকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা'। বিশ বছর বয়সে মৃত্যুকে শ্যামের সাথে তুলনা করে 'মরণরে তুঁহুঁ মম শ্যামসমান' এ গানটি কবি বৈষ্ণবপদাবলী দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁদের ভাষায় রচনা করেন। ১৮৮৩ সালের বাইশ বছর বয়সে রচিত গানের বাণী বিশ্লেষণে দেখতে পাবো কবির প্রাণের পরে প্রিয়তমের চলে যাওয়ার কথা। বসন্তের বাতাসের উষ্ণ ছোঁয়া যেন কবিকে ছুঁয়ে যায়। বলে না গেলেও কবি তাঁর উপস্থিতি অনুভব করেন প্রিয়তমের ফুটিয়ে যাওয়া ফুলে। গানটি গাইবার সময় একটানা গেয়ে শেষ করতে হয়। যেন গানের বাণীতেই বলা হয়ে যাচ্ছে কবির প্রিয়তমকে খোঁজার আকুতি। পুনরাবৃত্তি হলে গানটির ভাব প্রকাশে পরিপূর্ণতা পেত না। কোথা দিয়ে কোথায় প্রিয়তম হারিয়ে যাচ্ছে। কবি শুধু স্মৃতি রূপে তাঁর না বলে যাওয়া পরশ গুলিকে অনুভব করছেন। তাইতো বলেছেন-

আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল কে
বসন্তের বাতাসটুকুর মতো।
সে যে ছুঁয়ে গেল, নুয়ে গেল রে...

... হৃদয় আমার আকুল হল,

নয়ন আমার মুদে এল রে-

কোথা দিয়ে কোথায় গেল সে ॥

১৮৮৪ সালে রচিত 'মরি লো মরি আমার বাঁশিতে', 'মনে রয়ে গেল মনের কথা', 'কেহ কারো মন বুঝে না' গানগুলিতে কবির যে বেদনা বাণীতে প্রকাশ পায় তা শুধু একান্ত প্রেমিকের বেদনা। মনের কথা মনেই রয়ে গেল, কবির প্রেম শুধু চোখের জল, প্রাণের ব্যথা হয়েই থাকল প্রেম। ১৮৮৫ থেকে ১৮৮৯ সালে রচিত প্রেমের গানের বাণীতে পাই প্রথম দিকের সেই একি বিষাদময়তা। প্রতীক্ষারত প্রেমের বহিঃপ্রকাশ। যেমন কিছু গানের বাণীর প্রথম লাইন উল্লেখ করা হল-

- হল না লো, হল না, সই। (১৮৮৫)
- হেলাফেলা সারা বেলা। (১৮৮৬)
- তুমি কোন্ কাননের ফুল। (১৮৮৬)
- তবু মনে রেখো। (১৮৮৭)
- আমার পরান যাহা চায়। (১৮৮৮)

এ সময়গুলোতে কবি বলেছেন 'আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন তোমাতে করিব বাস'। ভুল করে ভুল ভাঙবার কথা বলেছেন, শুধু হাসি খেলায় সময় আর কবি পার করতে চাননি। প্রেম তো শুধু মিছে মিছে খেলা নয়। কবি তাঁর হৃদয়ের পূর্ণ ভালোবাসা দিয়েই ভালোবাসতে চান। তারপরও কবির প্রেম পূর্ণ নয়। আশায় আশায় দিন পার করছেন ভালোবাসার জন্য। এই অপেক্ষা এতটাই তীব্রতর হয় যে প্রিয়তমের অনুপস্থিতেই তিনি তাঁকে অনুভব করছেন। যেমন উল্লিখিত ভাবে কিছু গানের তালিকা-

- ভুল করেছিনু, ভুল ভেঙেছে। (১৮৮৮)
- সখী বহে গেল বেলা। (১৮৮৮)
- এতো খেলা নয়, খেলা নয়। (১৮৮৮)
- দিবস রজনী আমি যেন কার। (১৮৮৮)

১৮৮৮ সালে সাতাশ বছর বয়সে কবি সবচেয়ে বেশি (২৫টি) প্রেমের গান রচনা করেছেন। *মায়ারখেলা* গীতিনাট্যের গানগুলি কবির যৌবনকালের সার্থক প্রেমেরগান। এই গানগুলি রবীন্দ্রনাথের প্রেমপর্যায়ের গানে স্থান পেয়েছে। ২৭ বছরে রচিত গানগুলির কথা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বিচিত্র ভাবনার সমাহার। কখনও সে বিরহী, সকল হৃদয় দিয়ে ভালোবেসে ভয়ে ভয়ে অজানা পথে তাঁর বিচরণ। ভুবন মাঝারে প্রিয়জনের সীমা কোথায় তা জানাবার চেষ্টা। পৃথিবীতে ভালোবেসে যদি সুখ নাহি থাকে তবে কেন মিছে মিছি ভালোবাসার মায়া মরীচিকা। জগতে কোন কিছুরই অভাব নাই শুধু জীবন যৌবনে প্রেমেরই কুয়াশায় আচ্ছন্ন। ভুবনে শুধু প্রেমেরই ফাঁদ পাতা। আবার কবি বলেছেন যারে খুঁজে মরো সে তো রয়েছে মনে। পরক্ষণে বলছেন, বসন্ত কি জীবনে প্রথম

এল, নবীন জীবন যেন তার জীবন্ত হল। যার সুধাস্বর জগতের গীত হয়ে বাজে তাঁকেই তিনি দিকদিগন্তে খুঁজে বেড়ান। হৃদয়ের কথাটি বলার জন্য প্রাণ, মন ও দেহ সঁপে ব্যাকুল হয়ে ফিরেন গৃহত্যাগী কবি। প্রেমপর্যায়ের গানগুলিতে গীতিনাট্যের গানগুলি স্থান পায়। কালানুক্রমিক ভাবে সাজালে গানগুলি পর পর যখন চোখে পড়ে, তখন সেই বয়সে কবির গানের বাণীর 'ভাব ও ভাবনা' গুলো স্পষ্ট হয়। উল্লিখিত ভাব অনুসারে সাতাশ বছর বয়সে রচিত গানের কিছু তালিকা-

- অলি বার বার ফিরে যায়। (১৮৮৮)
- সকল হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছি। (১৮৮৮)
- ভালোবেসে যদি সুখ নাহি। (১৮৮৮)
- প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে। (১৮৮৮)
- আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল। (১৮৮৮) ইত্যাদি।

প্রথম পর্বের কালানুক্রমিক তালিকা দেখলে গানগুলির সাথে সরোজ-বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের মিল পাওয়া যায় । যেমন-

"... ষোলো বছর বয়সে গুটিকতক ভানুসিংহের পদ- প্রেমের কবিতাই বটে- কিন্তু কবিকে রাধার জবানিতে কথা বলতে হচ্ছে। সতেরো বছর বয়সে 'বলি, ও আমার গোলাপ-বালা'র-জন্ম হল আমেদাবাদ শাহিবাগ প্রাসাদের ছাদে। ... একেবারে প্রথম দিকে গানগুলির নারী-চরিত্র অবলীলাক্রমে বহন করে চলেছে রাধার উত্তরাধিকার। সখি সম্ভাষণের ছলে প্রেমের বেদনা জানানো, নারী হিসাবে নিরুপায়তার অনুভূতি- নিবেদন তো বটেই, এমন কি, এই সব গানের অনুষঙ্গেও যেন জড়ানো রয়েছে কখনো মাথুরের দূরাগত ক্ষীণ প্রতিধ্বনি (পচিঁশ বছর বয়সে লেখা 'ওগো এত প্রেম আশা'), কখনো বা বৈষ্ণব কবিতার পূর্বরাগের ছটা ('এখনো তারে চোখে দেখিনি') 'মরি লো মরি' (২৩ বছর বয়স) গানটি। শান্তিদেব ঘোষের কাছে শেষ বয়সেও রবীন্দ্রনাথকে টানত।"[৫]

এ সময়ে গানগুলির কথা প্রেমিক-প্রেমিকার বেদনার ধারক ও বাহক। বৈষ্ণবপ্রেম কবিতায় রাধার অনুভূতি ভীষণ রকম আবেগময়ী ও কারুণ্যসঞ্চারী যা সমাজে মানুষের কাছে একটা ধাক্কা খেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের অল্প বয়সের প্রেমের গানে এই প্রতিঘাত পাওয়া যায় না। তবে যে আবেদন পাওয়া যায় তা ব্যর্থ হয়নি প্রেমিক মনের জন্য। কেননা ভাগ্যের ফলে বঞ্চিত প্রেম যে পরিমাণ আকুতিময় সেই পরিমান হৃদয়াভিরাম। প্রেম হৃদয়ের শুধু একটা হৃদয়াবদ্য অংশ নয়, এ যেন নিজের জীবনের নবতর আবিষ্কার যা 'চিত্রাঙ্গদা'র গান থেকে কবির উপলব্ধিতে পাই।

আমরা কবির গানে ত্রিধার মিলনের যে কথাটি বলি, পরিণত পর্যায়ের গানের কথায় এর সূত্রপাতটি শুরু হয় প্রথম জীবনের গানের বাণীর মধ্যদিয়ে 'এমন দিনে তারে বলা যায়' (২৮ বছর বয়সের রচনা)। গানটিতে প্রাত্যহিক জীবনমাত্রা বিবর্ণ গ্লানি থেকে মুক্তির কথা বলেছেন- 'সমাজ সংসার মিছে সব/ মিছে জীবনের কলরব'। গানটিতে বর্ষার প্রকৃতির মধ্য দিয়ে জীবনের যে না বলা কথা রয়ে যায় সেই কথাই কবি ঘনঘোর বরিষায় বলতে চেয়েছেন। ভাব প্রকাশে দীর্ঘ লাইনের গানটির বাণীই যথেষ্ট। এর সাথে যে সুর কবি যুক্ত

করেছেন, তা গানের বাণীটিকে 'কথা ও সুরের' যুগলমিলন ঘটিয়ে জীবন্ত করে তুলেছেন শ্রোতার কাছে। কালানুক্রমিক সূচির প্রথম পর্বের এমনই প্রাথমিক বিরহ, বেদনা ও আকাঙ্ক্ষা, প্রকৃতির সাথে প্রেমের বাণীর মিলনের সূচনা পাব জনপ্রিয় গানগুলিতে-

- আমার মন মানে না। (১৮৯২)
- বড়ো বেদনার মত। (১৮৯৩)
- হৃদয়ের এ কূল ও কূল। (১৮৯৩)
- বাজিল কাহার বীণা। (১৮৯৪)
- চিত্ত পিপাসিত রে গীতসুধার তরে। (১৮৯৫)
- তোমার গোপন কথাটি। (১৮৯৫)
- পুষ্পবনে পুষ্প নাহি আছে অন্তরে। (১৮৯৫)
- কে দিল আবার আঘাত। (১৮৯৫)
- ভালোবেসে সখী নিভৃতে যতনে। (১৮৯৭)
- তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা। (১৮৯৭)
- কেন বাজাও কাঁকন কনকন কত ছলভরে। (১৮৯৭)

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান রচনায় তিনি যে আধুনিক, এ কথাটা আমরা সবসময়ই বলি। লিরিকধর্মীতা বৈশিষ্ট্যের কারণে আজ পর্যন্ত তাঁর প্রেমের গান অন্য কবি গীতিকারের তুলনায় আধুনিক। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্র গবেষক বলেন– "সব কবিই নিজেকে দিয়ে শুরু করেন, ধ্রুপদী/ রোমান্টিক/ মিস্টিক- যে নামেই তাকে চিনিয়ে দেওয়া যাক না কেন। কিন্তু সৃষ্টির প্যাটার্নের মধ্যে নিজেকে কোথায় কেমনভাবে স্থাপন করেন তাই নিয়েই তাঁর প্রধান পরিচয়।... কবি রচনা করেছেন দুটি ভিন্নমুখী মানসিকতা, প্রতিবেশ বা মুহূর্তের সহাধিষ্ঠান যেখানে আমি ও তুমি, বিরহ ও মিলন সমান সাথে মিলে যায়।... রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রেমের লিরিকে একই মুহূর্তে দুই ভিন্ন ভাবমণ্ডল বা অনুভূতি অথবা পরিমণ্ডল কে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।" [৬]

কালানুক্রমিক সূচির দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বের গানগুলিতে প্রেমের দ্বৈতরূপতা আরও স্পষ্ট বুঝতে পারব। দ্বিতীয় পর্বের প্রথম দিককার গানগুলোতে সেই একই বিষাদময়তা, মনের মাঝে আকুলতা কিছু দূর পাওয়া যাবে। যেমন–

- নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ। (১৯০০)
- কেন সারাদিন ধীরে ধীরে। (১৯০১)
- কী সুর বাজে আমার প্রাণে। (১৯০৪)

প্রেমের গানের বাণী বিশ্লেষণে দেখা যায় ১৯০৯ সালের পূর্বের গানগুলি মূলত প্রেমিক বা প্রেমিকার গান। গানের বাণীর বৈশিষ্ট্যগুলো চোখে পড়ে অনুভূতির একরৈখিক সরলতা, অকৃত্রিমতা এবং ভাবাবেগের গভীরতা।

১৯০৯ থেকে ১৯১২ সালের প্রেমের গানের বাণীতে কবি তাঁর কল্পনা প্রেয়সীকে দুঃখের বোঝা না সইবার কথা বলছেন। কবি প্রাথমিকভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছেন পাওয়া না পাওয়ার ঊর্ধ্বে। তিনি সুখে ও দুঃখে আনন্দে থাকবেন। প্রেয়সীর সাথে কথা না বলেও মনের কথা বলতে পারবেন। তিনি বলছেন–

কে বলেছে তোমায়, বধুঁ, এত দুঃখ সইতে
আপনি কেন এলে বধুঁ, আমার বোঝা বইতে ॥...
...আমি সুখে দুঃখে পারব, বন্ধু, চিরানন্দে রইতে–
তোমার সঙ্গে বিনা কথায় মনের কথা কইতে।

মান অভিমান ভুলে সামনের পথে এগিয়ে যাবার কথা, প্রেমিকার রঙে কালো- ধলো- রঙিন হবার কথা, প্রিয়ের সাথে প্রাণের খেলার কথা বলেছেন। কিছু গানের চার পাঁচ লাইনের বক্তব্যে চমৎকার সম্পূর্নতা পেয়েছে গানের। ভালোবাসার আড়াল থেকে কবি যাকে দেখতে পান, তার প্রতীক্ষায় সকল কিছু নিয়ে পথ চেয়ে থাকবার কথা বলেছেন। যেমন–

- মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে। (১৯০৯)
- যা ছিল কালো ধলো। (১৯১০)
- আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা। (১৯১০)
- আমার সকল নিয়ে বসে আছি। (১৯১০)

দ্বিতীয় পর্বের গানে প্রিয়সঙ্গসুখের নির্মল আনন্দ অনুভবতা পাওয়া যায়। কবি রূপের বাঁধনে না বেঁধে ভালোবাসায় ভোলাতে চান। এসময় কবি প্রেমিকার জন্য অপেক্ষারত নন। তিনি সামনের দিকে চলার কথা বলেছেন, রোমান্টিক কবির ব্যাকুলতা, অস্থিরতা বাণীর অবয়বে পাওয়া যায়। যেমন–

- আমি রূপে তোমায় ভোলাব না। (১৯১০)
- বিরহ মধুর হল আজি। (১৯১০)
- আমি তোমার প্রেমে হব সবার। (১৯১১)
- কবে তুমি আসবে বলে। (১৯১১)
- ঘরেতে ভ্রমর এল গুন্‌গুনিয়ে। (১৯১১)
- তুমি একটু কেবল বসতে দিয়ো। (১৯১২)
- ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো। (১৯১২)

১৯১২ থেকে ১৯১৮ সালের গানগুলিতে পাওয়া যায় ভালোবাসার বৈচিত্র্য সন্ধানী কবির প্রাথমিক রূপটি। কবিকে যেন তাঁর সমস্ত কাজে নাম না জানা কেউ কাঁদায়। ভুবন ভরা বেদনা তাঁর যেন জীবন ধরে বয়ে বেড়াতে হবে। বেদনায় যেন কবির পেয়ালা ভরে গিয়েছে। যেমন–

- যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা। (১৯১৪)
- বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা। (১৯১৪)

রাতের বেলা কবির যে গান মনে পড়ে, তখন তিনি প্রেমিকাকে পান না আবার পাখির গানে যখন আকাশ মুখরিত, তখন অনুভব করেন যে তাঁর প্রিয়তম তাঁর সাথে আছে। নিশীথরাতে বাদল ধারা হয়ে যে কবিকে কাঁদায়, কবি চান সবাই যখন ঘুমের ঘোরে থাকে তখন সুরের রূপে যেন সে চোখের জল হয়ে সাড়া দেয়। এসময় প্রেমিক চিত্তে গানের বাণীতে ফুটে ওঠে–

- কাল রাতের বেলা গান এল মোর মনে। (১৯১৫)
- আমার নিশীথরাতের বাদল ধারা। (১৯১৫)
- ওরে আমার হৃদয় আমার আকাশ। (১৯১৬)
- পাখি আমার নীড়ের পাখি। (১৯১৮)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রেমের গান সম্পর্কে রবীন্দ্র গবেষকের মতামত–

"রবীন্দ্রনাথের নারী, সংগীতে, বড়ো গভীর অনুভূতির অধিকারিণী। তার এই প্রেমকে দীনতা বলতে লজ্জা হয়। এ তাঁর প্রেমসম্পদ। প্রিয় আসুক না আসুক– প্রিয়ের বাস্তব অস্তিত্ব পর্যন্ত থাকুক না থাকুক– এ প্রেম কিছুরই অপেক্ষা রাখে না বাস্তবিক।"[৭]

তিনি আরও বলেন–

"...মনে পড়ে 'হাসিটুকু, কথাটুকু নয়নের দৃষ্টিটুকু'-তে 'প্রেমের আভাস' লক্ষ্য করবার কথাও সতর্ক কবি বলে রেখেছেন। তবু হৃদয়যমুনাতে কখনো তল-তল-ছল-ছল প্রেম, কখনো ঝাঁপ দেবার মতো প্রেম, গাহন করবার প্রেম, আবার মরণ লাভ করবার মতো অতলান্ত প্রেমের কথা বলে রেখে তিনি বিচিত্র শ্রেণীর প্রেমলীলা সম্পর্কে চেতনা শিখিয়েছেন।"[৮]

পূর্বের দুইটি পর্বে আমরা প্রেমের গানের বাণীতে এই বিচিত্র শ্রেণির প্রেমলীলার অবয়ব পেয়েছি। কালানুক্রমিক সূচির তৃতীয় পর্বে এসে দেখতে পাবো প্রেমের গানের বাণীতে কবির পরিণত বয়সের গানের রূপ দেবার পালা। প্রেমপর্যায়ে তাঁর রচিত গীতিনাট্য কিংবা নৃত্যনাট্যের গানগুলিকে পাই। তবে এগুলিকেও কালানুক্রমিক সূচিতে প্রেমের গান হিসাবে চিন্তা করে বাণী বিশ্লেষণ করব। কারণ, চিত্রপটে কিছু গানের রচনার কাহিনীর পটভূমিকে যদি না আনি, তাহলে বয়স ক্রমে প্রেমের গানের বাণীর রূপটি বুঝতে সুবিধে হবে। সূচির দ্বিতীয় পর্বেই কবিকে দেখেছি, কবি প্রিয়তমের জন্য অপেক্ষারত নন। চিরপথিক কবি ভালোবাসার আশ্রয় ও আনন্দ খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর চলার ছন্দে।

প্রেমের গানের বাণীর মূল সুর বেদনা। এই বেদনা কে কবি শেষ পর্বে এসে পেয়েছেন সম্ভোগ বাসনার ঊর্ধ্বে। জীবনভর স্বপ্নসঙ্গিনীকে যেভাবে তিনি খুঁজেছেন, সেই চিনতে না পারার বেদনা, আকুলতা আরও তীব্রতর হয়ে প্রকাশ পায় এই পর্বের গানের বাণীতে। তারপরও চিরঅতৃপ্ত অথচ নিজের মধ্যে নিজে মগ্ন প্রেমকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। কালানুক্রমিক সূচির তৃতীয় পর্বের কিছু গানের তালিকা উল্লেখ করছি–

- আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে। (১৯১৯)

- আমার মনের মাঝে যে গান বাজে। (১৯২১)
- তোমায় গান শোনাব। (১৯২৩)
- দিনশেষের রাঙা মুকুল। (১৯২৩)
- আন্‌মনা আন্‌মনা। (১৯২৪)
- গানের ভেলায় বেলা অবেলায়। (১৯২৫)
- হে ক্ষণিকে অতিথি। (১৯২৫)
- আমায় থাকতে দে না। (১৯২৫)
- বিরস দিন বিরল কাজ। (১৯২৬)
- এ পথে আমি যে গেছি বারবার। (১৯২৬)
- সে দিন দুজনে দুলেছিনু বনে। (১৯২৭)
- তুমি আমায় ডেকেছিলে। (১৯২৭)
- বাহির পথে বিবাগি হিয়া। (১৯২৮)
- কাঁদালে তুমি মোরে। (১৯২৯)
- সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে। (১৯৩০)
- বাজে করুণ সুরে হায় দূরে। (১৯৩১)
- না চাহিলে যারে পাওয়া যায়। (১৯৩৩)
- হে সখা, বারতা পেয়েছি মনে মনে। (১৯৩৪)
- জানি জানি তুমি এসেছ। (১৯৩৫)
- দে তোরা আমায় নূতন করে। (১৯৩৬)
- জীবনে পরম লগন। (১৯৩৮)
- যদি হায় জীবন পূরণ নাই হল মম। (১৯৩৯)

তৃতীয় পর্বের তালিকায় প্রেমের গান রচনার সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। কালানুক্রমিক কিছু গান কে নিয়ে একটি ছোট তালিকা উল্লেখ করলাম প্রেমের গানের বাণীর বৈচিত্র্যতা বুঝতে। এ পর্যায়ে এসে কবির হৃদয় প্রেয়সীর রঙের গৌরবে রঙিন হতে চায়। আর সেই রঙ সবার মাঝে ছড়াতে চান। প্রকৃতি ও প্রেমের যুগল মিলনে কবির মনে যে গান বাজে তা কি ভালোবাসার মানুষটি শুনতে পায়। কবিগুরু ও দীলিপকুমারের সাথে পত্রালাপে বলেন-

"যবে কাজ করি,
প্রভু দেয় মোরে মান।
যবে গান করি
ভালোবাসে ভগবান।

... প্রকাশলীলায় গান কিনা সবচেয়ে সূক্ষ্ম- ethereal- তাই তো সে অপরের স্বীকৃতির স্থুলতার অপেক্ষা রাখে না। শুধু-তাই নয়, নিজের হৃদয়ের বাণীকে সে রাঙিয়ে তোলে সুরে। যেমন, ধরো, যখন ভালোবাসার গান গাই তখন পাই শুধু

গানের আনন্দকেই না, ভালোবাসার উপলব্ধিকেও মেলে এমন এক নতুন নৈশ্চিত্যের মধ্য দিয়ে যে, মন বলে পেয়েছি তাকে যে অধরা, 'যে আলোকবাসী যে কাছের থেকে দেয়না ধরা দূরের থেকে ডাকে'।"[৯]

প্রেমের গানে কবির প্রেমিকা অধরার মধ্যে থেকে দূর থেকেই যেন কবির মনে সাড়া দেয়। ভালোবাসার প্রদীপ যেন নিশীথসমীরে নিবে যায়। কবি যে উপরের উক্তিতে শেষে বলেছেন- 'কাছে থেকে ধরা দেয় না প্রিয়তম'। গানে বলেছেন- 'ধীরে ধীরে এসে তুমি যেয়ো না গো ফিরে'। প্রেমিকার কাল্পনিক উপস্থিতি কবি অনুভব করেন, আর আহ্বান করেন তাঁকে একা ফেলে না যাবার জন্য। কবির গানে প্রেয়সীর সাথে মিলনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন যেখানে, একই সাথে সেখানে মিলনের অপেক্ষাও চোখে পড়ে। মিলনের আকাঙ্ক্ষা ও অপেক্ষা দুই মিলে গানের কথায় পাই অপূর্ব প্রেমের সৃষ্টি। পুরোপুরি কবির গানে প্রেমের বিশুদ্ধ মিলন নেই, আছে না পাওয়ার মধ্যেও মিলনের প্রত্যাশা। কবির প্রেমের গানের মিলন বলতে কাল্পনিক রূপটিই পাই। তৃতীয় পর্বের একটি গান-

দিনশেষের রাঙা মুকুল জাগল চিতে।
সঙ্গোপনে ফুটবে প্রেমের মঞ্জরীতে॥
মন্দবায়ে অন্ধকারে দুলবে তোমার পথের ধারে,
গন্ধ তাহার লাগবে তোমার আগমনীতে-
ফুটবে যখন মুকুল প্রেমের মঞ্জরীতে॥
রাত যেন না বৃথা কাটে প্রিয়তম হে
এসো এসো প্রাণে মম, গানে মম হে।
এসো নিবিড় মিলনক্ষণে রজনীগন্ধার কাননে
স্বপন হয়ে এসো আমার নিশীথিনীতে
ফুটবে যখন মুকুল প্রেমের মনঞ্জরীতে॥

কবির চিত্তে দিনান্তের রাঙা মুকুল প্রেমমঞ্জরীতে সঙ্গোপনে ফুটেছে। অন্ধকারের মৃদু বাতাসে পথের ধারে মঞ্জরী দুলতে থাকবে। প্রেমিকার আগমনীতে প্রেমমঞ্জরী সুগন্ধে ভরে উঠবে। প্রিয়তমের অনুপস্থিতিতে তিনি বৃথা রাত কাটাতে চান না, তাকে তাঁর প্রাণে ও গানে উপস্থিত থাকবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। রজনীগন্ধার বনে গন্ধঘন মিলনক্ষণে, স্বপনে মনের রাঙা মুকুল যখন প্রেমে মঞ্জরিত হবে, তখন কবি প্রেমিকাকে প্রিয় মিলনের জন্য আসবার কথা বলেছেন। এখানে গানের বাণীতে কবির প্রেমের যে চেতনা, তা স্বপ্নমিলনের। গানের বাণীতে প্রেমের ভাবটি সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে।

কবিতা থেকে গানে রূপান্তরিত গানগুলিতে শব্দগত পরিবর্তনও প্রেমের গানের বাণীর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। কবিতায় শুধুমাত্র পাঠের জন্য নান্দনিকতা বজায় রাখতে ছন্দের প্রয়োজনে শব্দ যুক্ত করা হয়, গানে সেই শব্দের

পরিবর্তন ঘটিয়ে অনন্য প্রেমের গান সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ কবিতার প্রয়োজনীয় ছন্দ গানের বাণীতে অব্যাহত রাখার প্রয়োজন থাকে না। *পূরবীর আনমনা* কবিতার গীতরূপান্তর পাই আমরা 'আনমনা, আনমনা' লাইন দিয়ে যেমন-

কবিতায় :

আনমনা গো আনমনা

তোমার কাছে আমার বাণীর মালাখানি আনব না।

গানের বাণী :

আন্‌মনা, আন্‌মনা

তোমার কাছে আমার বাণীর মাল্যখানি আনব না।

কবিতার পাঠের প্রয়োজনে 'গো' ও 'মালাখানি' শব্দ দুটি উপযুক্ত। বারবার পাঠে তা উপলব্ধি করা যায়। গানের ছন্দের প্রয়োজনে 'গো' শব্দটি না রেখে এবং 'মালা' শব্দটির গুরুত্ব আরও বলিষ্ঠ করার জন্য 'মাল্যখানি' কবি ব্যবহার করেছেন। কবিতায় ছন্দটি চতুর্মাত্রিক আর গানে ত্রিমাত্রিক ছন্দে পরিবর্তিত শব্দগুলি সার্থকতা পায় সুরযোজনায়।

কবির *মায়ারখেলা* গীতিনাট্য দিয়ে মানবীয় ভালোবাসার আবেগঘন প্রতিফলনে প্রেমের যাত্রার সূচনা হয়। প্রেমের গানের কালানুক্রমিক সূচির প্রথম পর্বের গানের তালিকায় গানগুলিকে পেয়েছি। আর *শ্যামা* নৃত্যনাট্যের মধ্যদিয়ে কবির ভালোবাসার বেদনার পরিসমাপ্তি দেখতে পেয়েছি প্রেমের গানের কালানুক্রমিক সূচির তৃতীয় পর্বে। যেমন, কিছু গানের উদাহরণ-

- ফিরে যাও কেন।
- জীবনে পরম লগন।
- ধরা সে যে দেয় নাই।
- নীরবে থাকি সখী।
- আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া।

এই পর্বের গানের বাণীতে স্পষ্টত ঈশ্বর, প্রকৃতি ও মানব কবির প্রেমচেতনায় একীভূত হয়েছে প্রিয়তমকে প্রকৃতিতে 'তুলনাহীনা' রূপে কল্পনা করেছেন। যেমন-

সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে

দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে ॥...

প্রেমের গানের বাণীর শেষে এসেও কবির একই বেদনার সুর পাওয়া যায়। তবে প্রেমের গানের বাণী কালানুক্রমিক পর্যালোচনায় দেখতে পাই গানগুলির কথা শুধু ব্যক্তি কবির একান্ত মনের ভাব নয়, এ যেন সকলের। নারী, পুরুষ সকলের মনের কথা যেন গানের বাণীতে। প্রথম পর্বের গানে ব্যক্তি কবির প্রেমের অনুভব

কিছুটা পাওয়া যায়। তবে প্রথম জীবনের এই প্রেমানুভূতি কবি সম্পদ হিসাবে নিজের কাছে গচ্ছিত রেখে পরিণত বয়সে রচনা করেছেন বিশ্ব-নাগরিকের প্রেমের অনুভূতির প্রকাশ। কবির প্রেমের গানের কথায় মিলন যেন কল্পনাশ্রিত স্বপ্ন। কবির অন্তরে যিনি বিরাজমান, তার সাথে কবির গভীর সম্পর্কই যেন কবিকে পাওয়া না পাওয়ার ঊর্ধ্বে নিয়ে যেতে পেরেছেন। কবির প্রিয়তম কখনও প্রেমিকারূপে, কখনও অন্তরের ঈশ্বররূপে কিংবা প্রকৃতিতে তুলনাহীনা রূপে নানান বৈচিত্র্যময়তায় কবিকে প্রেমের গানের বাণীতে অধরা রূপে ধরা দিয়েছেন। পরিণত বয়সের প্রেমের গানের শেষ গানটিতেও পাওয়া যায় আক্ষেপের সুর। কবির মন এখনও যেতে চায় না কল্পনার প্রিয়তমের দুয়ার অতিক্রম করে। শত বাধায় অকারণ ফিরে আসা তাঁর প্রিয়সঙ্গের কাছে। হয়তো অনেক কিছু কবি দিতে চেয়েছিলেন তাকে, চলতি জীবন পথে সবকিছুই কবির কাছে মিছে মনে হয়। তাইতো প্রেমের গানের শেষ গানটিতে কবি বলেছেন-

আমার যেতে সরে না মন-
তোমার দুয়ার পারায়ে আমি যাই যে হারায়ে
অতল বিরহে নিমগন॥...
... যবে চলে যাই পদে পদে বাধা পাই
ফিরে ফিরে আসি অকারণ॥

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানের সুর :

কবিগুরু তাঁর রচিত গানগুলিকে ধ্রুপদ, খেয়াল, বাউল, কীর্তন, টপ্পা প্রভৃতি সুর অবলম্বন করে রচনা করেছেন। বিদেশী সুর দ্বারাও অনুপ্রাণিত হয়েছেন, আবার কখনও অনুপ্রাণিত হয়েছেন প্রাদেশিক বিভিন্ন সুর দ্বারা। তাঁর গানের বাণী ও সুরের সফল স্বার্থকতা হলো তাঁর গীতকুশলতায় নিজস্বতা। প্রত্যেকটি গান বিভিন্ন রাগরাগিণীর সুর ও ছন্দ দ্বারা প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথের প্রেমপর্যায়ের গানেও আমরা বিভিন্ন ধরনের সুরবৈচিত্র্য পাই। সুরের বৈচিত্র্যতায় প্রেমের গানে পাই ধ্রুপদের সুর, খেয়ালের সুর ও তালের প্রভাব। যেমন, কিছু গানের তালিকা-

- তোমারেই করিয়াছি। (ঝাঁপতাল, ছায়ানট)
- সুন্দর হৃদিরঞ্জন। (একতাল, ইমন কল্যাণ)
- চিত্ত পিপাসিত রে। (ঝাঁপতাল, খাম্বাজ)
- তুমি যেয়ো না এখনি। (ত্রিতাল, ভৈরবী)
- কেন বাজাও কাঁকন কন কন। (তেওড়া, কাফি)
- দীপ নিবে গেছে মম। (ঝাঁপতাল, বেহাগ)
- নিদ্রাহারা রাতের এ গান। (ষষ্ঠী, গৌড় সারং)
- হায় অতিথি, এখনি কি হল তোমার। (ষষ্ঠী, ভৈরবী)
- কাঁদালে তুমি মোরে। (ঝাঁপতাল, দেশ)

রবীন্দ্রনাথের কৈশোর পারিবারিক ভাবে উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের বলয়ে বেড়ে ওঠা। তাই কালানুক্রমিক সূচির প্রথম পর্বে ধ্রুপদ-খেয়ালের সুর ও তালের প্রভাব বেশি পাওয়া যায়। পরবর্তী পর্বগুলোতে খুবই সামান্য দুই-একটি গানে আমরা এ সকল সুর ও তালের প্রভাব পেতে পারি। ছন্দের ক্ষেত্রে ঝাঁপতাল, ত্রিতাল, একতাল, তেওড়া হলেও, বেদনার সুরটি ঠিক ভাবেই ফুটে ওঠে সুরে। প্রত্যেকটি রাগের একটি নিজস্ব রূপ ও সৌন্দর্য আছে। রবীন্দ্রনাথ রাগরাগিণী নিয়ে গানের সুরে বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না। তবে তিনি বিশ্বাস করতেন রাগরাগিণী ও বিশ্ব সৃষ্টির মধ্যে সংযোগ আছে। তাই এটি শুধু মানুষের গান নয়, এটি সমস্ত জগতের। কবি মনে করতেন-

"... ভৈরোঁ যেন ভোরবেলার আকাশেরই প্রথম জাগরণ; পরজ যেন অবসন্ন রাত্রিশেষের নিদ্রাবিহবলতা, কানাড়া যেন ঘনান্ধকারে অভিসারিকা নিশীথিনীর পথবিস্মৃতি, ভৈরবী যেন সঙ্গবিহীন অসীমের চিরবিরহবেদনা; মূলতান যেন রৌদ্রতপ্ত দিনান্তের ক্লান্তিনিশ্বাস; পূরবী যেন শূন্যগৃহচারিণী বিধবা সন্ধ্যার অশ্রুমোচন।"[১০]

আমরা আমাদের মনের ভাব বা আবেগ কোন না কোন রাগিণীতে প্রকাশ করি। এ সম্পর্কে *সংগীত ও ভাব* প্রবন্ধে কবি বলেছেন-

"কোন্ সুরগুলি দুঃখের ও কোন্ সুরগুলি সুখের হওয়া উচিত দেখা যাক। কিন্তু তাহা বিচার করিবার আগে, আমরা দুঃখ ও সুখ কিরূপে প্রকাশ করি দেখা আবশ্যক। আমরা যখন রোদন করি তখন দুইটি পাশাপাশি সুরের মধ্যে ব্যবধান অতি অল্পই থাকে। রোদনের স্বর প্রত্যেক কোমল সুরের উপর দিয়া গড়াইয়া যায়, সুর অত্যন্ত টানা হয়। আমরা যখন হাসি- হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, কোমল সুর একটিও লাগে না, টানা স্বর একটিও নাই, পাশাপাশি সুরের মধ্যে দূর ব্যবধান, আর তালের ঝোঁকে ঝোঁকে সুর লাগে। দুঃখের রাগিণী দুঃখের রজনীর ন্যায় অতি ধীরে ধীরে চলে, তাহাকে কোমল সুরের উপর দিয়া যাইতে হয়। আর সুখের রাগিণী সুখের দিবসের ন্যায় অতি দ্রুত পদক্ষেপে চলে, দুই-তিনটা করিয়া সুর ডিঙাইয়া যায়। আমাদের রাগরাগিণীর মধ্যে উল্লাসের সুর নাই। .... তবে আমাদের দেশীয় সংগীতে রোদনের সুরের অভাব নাই। সকল রাগিণীতেই প্রায় কাঁদা যায়। একেবারে আর্তনাদ হইতে প্রশান্ত দুঃখ, সকল প্রকার ভাবই আমাদের রাগিণীতে প্রকাশ করা যায়।"[১১]

কবির এই মন্তব্য তাঁর প্রেমের গানের সুরেও আমরা পাই। ভৈরবীর সুরে অনেক প্রেমের গান আছে। একটি গানের স্বর বিশ্লেষণ করলাম-

ঋসা - া II সা জ্ঞা - া । জ্ঞমা মা -পমা I

কা ল্ রা তে র বে লা ০

দাদরা তালে নিবদ্ধ গানটিতে যে বিষাদময়তা আমরা পাই তা যেন তালের সমের দুই মাত্রা আগে কোমল 'ঋসা' স্বরটিতে 'কাল' শব্দটি প্রয়োগে স্পষ্টতা পেয়েছে। শুধু যদি 'সা' দিয়ে অর্থাৎ কোমল ঋসভ না ব্যবহৃত হয় তাহলে ভৈরবীর যে বিষাদময়তার কথা কবি বলেছেন তা ফুটে উঠত না। পরবর্তী লাইনে, 'তখন তুমি ছিলে না গো মোর সনে'। লাইনটি দু'বার গেয়ে কাছে না থাকবার আবেদনটি ভৈরবীর কোমল স্বরগুলি ব্যবহার করে

আরো আবেদনময়ী হয়েছে। সম্পূর্ণ গানটিতে কোমল দ, ণ, ঋ, জ্ঞ স্বরগুলির ব্যবহারে কবির না বলা কথাটি নীরব চোখের জ্বলে জীবন অতিবাহিত হওয়ার কথা প্রকাশ পেয়েছে। কবির ভাষায় বেদনার সুরগুলি যে কোমল স্বরে অধিক প্রকাশ পায় তার প্রমাণ পাই।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমপর্যায়ের গানে বাউল ও কীর্তন সুর এবং কিছু পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের সুরের গানও পাই। প্রথম জীবনে বাউলদের সাথে সরাসরি সাক্ষাত ও বিলেত ভ্রমণ তাঁকে এই সুরগুলি দ্বারা আকৃষ্ট করেছিল। যেমন কিছু গানের উদাহরণ-

বাউল কীর্তন সুরে :

- আমার মন বলে চাই, চাই গো। (বাউল)
- কোন সে ঝড়ের, ভুল। (কীর্তন)
- নানানা) ডাকব না, ডাকব না। (বিভাস, কীর্তন)
- আন্‌মনা, আন্‌মনা। (কীর্তনাঙ্গ)
- না চাহিলে যারে পাওয়া যায়। (কীর্তনাঙ্গ)

পাশ্চাত্য সুর ও প্রভাব দ্বারা রচিত গান :

- আমি চিনি গো চিনি তোমারে।
- সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে।

ভানুসিংহের পদাবলীর বৈষ্ণবভাবাদর্শের 'মরণরে তুঁহুঁ মম শ্যামসমান' গানটি ও পাই প্রেমপর্যায়ে। কীর্তনের সুরে গানটিতে কিছু অংশ তাল ছাড়া আবার কিছু অংশ তালে গাইবার পদ্ধতিতে গানটিতে এক অপূর্ব সুরের আবহ সৃষ্টি করে। প্রেমপর্যায়ের গানে মুক্তছন্দ বা তাল ছাড়া গানও রয়েছে কিছু। যেমন, কিছু গানের উদাহরণ-

- তবু মনে রেখ।
- এরা পরকে আপন করে।
- আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা।
- আমি রূপে তোমায় ভোলাব না।
- বড়ো বেদনার মত।
- এমন দিনে তারে বলা যায়।

কবি মুক্ত ছন্দের কিছু গানের সুরগুলি আবার তালেও স্বরলিপি করেছেন। কীর্তনাঙ্গের একটি গান 'তবু মনে রেখ'। গানটি মুক্ত ছন্দে যখন গাওয়া হয় তখন পরের 'তবু' অংশটির সুর কোমল স্বর দিয়ে এমন ভাবে গড়িয়ে পড়ে, যেন ঠিক শ্রোতার বুকেও নব প্রেমে পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে, তবুও যেন কবিকে মনে রাখে সেই আর্তিই

ফুটে ওঠে। 'তবু' শব্দটির স্বর বিন্যাস গানে তিনটি ভাবে পাই। যেমন- স্থায়ী শুরু হয় 'সা ন্া' তার পরে দেখতে
ত বু

পাই 'মগা রগা -ঃরস ঃ' এই অংশ গানটির কয়েক জায়গায় একই রকমভাবে পুনরাবৃত্তি হয়। সব শেষের
ত০ বু০ ০০০

'তবু' শব্দটির সুর-

নর্সা –া –ণদা২ দ২ণা – দ২ণা –দ২ণাদপ
ত ০ ০০ বু ০ ০০ ০০

কোমল স্বর ণ, দ কে গড়িয়ে সুরটি যখন নামছে তখন শব্দটির আবেদন আরও বলিষ্ঠ রূপে গানে প্রকাশ পাচ্ছে। সুরের ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য 'রাগ নির্ণয়' উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের একটি রাগের অন্তর্গত যতগুলোই রচনা থাকুক সবই একই নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতে রাগ নির্ণয় একটু কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ রবীন্দ্রনাথ কবি হিসেবে গান রচনা করেছেন। 'কথা ও সুর' তার গানে যুগলমিলন ঘটে। তিনি গান রচনা ও সুর দেওয়া দু'টো একই সাথে করতেন। তাঁর কাছে 'সুর' গানের 'কথা' কে ফুটিয়ে তুলবে এতেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাই রাগ রূপের শুদ্ধতা বজায় রাখার থেকেও তিনি গানের বাণীর ভাব যেভাবে বেশি প্রকাশ পাবে সেভাবেই সুর প্রয়োগ ও স্বরের ব্যবহার করতেন। ফলে কোন গানের শুরুটা একটি নির্ধারিত রাগের চলনে হলেও দেখা যায় পরের অংশে বাণীর ভাবকে অক্ষুন্ন রাখতে এমন একটি স্বরের ব্যবহার করেছেন যে নির্ধারিত রাগের শুদ্ধতায় বিঘ্ন ঘটে। ফলে মিশ্র রাগের নামকরণ হয় গানে বা ওই নির্দিষ্ট রাগের আঁধারে কবির গানের সুর রচিত বলে নামকরণ হয় রাগের। যেমন- 'আমি এলেম তারি দ্বারে' গানটি মিয়াঁ কি সারং রাগের, কিন্তু গানের প্রথম লাইনের শেষে একবার কোমল গান্ধার - 'রা –জ্ঞা জ্ঞর সা' (যে স্বর নাকি মিয়াঁ কি সারং এ প্রয়োগ হয় না) ব্যবহৃত
রে ০ আ মি

হয়েছে। আবার সঞ্চারীতে একবার শুদ্ধ গান্ধার (গমা –গমা রা –া) ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে রবীন্দ্রসংগীতের মিশ্র
থে ০ ০ কে ০

প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে গানটিতে 'মিয়াঁ-কি-সারং' রাগের অন্তর্গত করা যায়। কবিগুরু তাঁর গানে রাগ নির্দেশ করার ব্যাপারে মোটেই উৎসাহ দিতেন না। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে লিখিত পত্রে এ প্রসঙ্গে বলেন-

"গানের কাগজে রাগরাগিণীর নাম নির্দেশ না থাকাই ভালো। নামের মধ্যে তর্কের হেতু থাকে, রূপের মধ্যে থাকে না। কোন রাগিণী গাওয়া হচ্ছে বলবার কোনো দরকার নেই। কী গাওয়া হচ্ছে সেটাই মুখ্য কথা, কেননা তার সত্যতা তার নিজের মধ্যেই চরম। নামের সত্যতা দশের মুখে সেই দশের মধ্যে মতের মিল না থাকতে পারে। কলি যুগে শুনেছি নামেই মুক্তি কিন্তু গান চিরকালই সত্যযুগে।"[১২]

কবিগুরু রাগের রূপে যে পরিবর্তন অবচেতন মনে তাঁর বাণী ও সুরের মিলন রক্ষা করার জন্য করেছেন তা অত্যন্ত পরিমিতিবোধের মাধ্যমে। কারণ রাগরূপের পরিবর্তনে গানের সুরের সৌন্দর্য ও বাণীর ভাব অক্ষুন্ন থাকে। আর এখানেই তাঁর সঙ্গীত রচয়িতা হিসাবে সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথের প্রেমপর্যায়ের গানের সুরে বাউল

এবং কীর্তনাঙ্গের সুর ব্যতীত অন্যান্য অনেক রাগ ও রাগের মিশ্রণে রচিত গান আছে। রবীন্দ্রনাথের রাগের মত তালের ও নির্দেশ গানে দিতে আগ্রহ বোধ করতেন না। রবীন্দ্রনাথ *সংগীত ও মুক্তি* প্রবন্ধে বলেন-

"...কবিতায় যেটা ছন্দ, সংগীতে সেইটেই লয়। এই লয় জিনিসটি সৃষ্টি ব্যাপিয়া আছে, আকাশের তারা হইতে পতঙ্গের পাখা সমস্তই ইহাকে মানে বলিয়াই বিশ্বসংসার এমন করিয়া চলিতেছে, অথচ ভাঙিয়া পড়িতেছে না। অতএব কাব্যেই কী, গানেই কী, এই লয়কে যদি মানি তবে তালের সঙ্গে বিবাদ ঘটিলেও ভয় করিবার প্রয়োজন নাই।"[১৩]

গানে তালের ছন্দ প্রসঙ্গে বলেন-

"... বাণী স্বভাবও অর্থবাহী বলে, ভাবের কথা চিন্তা করতে গেলে আমরা বাণীর বক্তব্য দিয়েই প্রথমে প্রভাবিত হই।... 'কেন সারাদিন ধীরে ধীরে' গানটির এই 'ধীরে ধীরে' পদ প্রথমেই গানের শান্ত গতিকে বাঙ্ময় করে তোলে। তারপর, 'কী কুসুম- বাসে'-'ফাগুন-বাতাসে' হৃদয়ের উদাসী হবার কথা স্পষ্টই বলা আছে। কিন্তু, বাণীতে জীবনসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়বার কথা, চলবার কথাও বলা হয়েছে। অথচ সুরে বা গানের গতিতে চলবার উৎসাহ দেখি না। উৎসাহবচন উচ্চারণ করেও যখন চরণ চলে না। উদাস হৃদয়ে চলবার বাসনা জাগে না, তখন সুরে ছন্দেই কেবল সে ভাব প্রকাশ হতে পারে।"[১৪]

কিছু গানের সরল কথা সুর ও ছন্দ যোগের মধ্য দিয়েই যেন গানের চিত্রপটে প্রাণ পায়। সুর ও ছন্দ যেন গানের বাণীর না বলা কথাকে গানে অপূর্বভাবে প্রকাশ করে। প্রেমপর্যায়ের গানের বাণী, সুর ও তালে অনন্য এমন অনেক গান আমরা পাই যা কোন 'বিশেষ' অঙ্গের গান নয়, তা যেন ফুটে ওঠে কবিগুরুর অসাধারণ প্রেমের গান হিসেবে। যেমন কিছু গানের উদাহরণ-

- তুমি তো সেই যাবেই চলে। (পূরবী, একতাল)
- কাঁদালে তুমি মোরে। (দেশ, ঝাঁপতাল)
- দিনশেষের রাঙা মুকুল জাগল চিতে। (পূরবী, কাহারবা)
- যদি হায় জীবন পূরণ নাই হল মম। (ভীমপলশ্রী-মুলতান, কাহারবা)
- অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দ বন্ধনে। (মিশ্র বেহাগ, দাদরা)
- আমি যে গান গাই জানিনে সে। (ভৈরবী, কাহারবা)

রবীন্দ্রনাথের প্রেমপর্যায়ের গানের তালিকায় অন্তর্গত গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের গানগুলিতে নাটকের ও নৃত্যের প্রয়োজনে গানের ছন্দের গতির পরিবর্তন কোথাও দ্রুততর কোথাও ধীর লয়। তবে প্রেমের গান হিসাবে যখন গায়ক গান, তখন বাণীর ভাবের প্রয়োজন অনুযায়ী ছন্দে গানটি গান। কবিগুরু *সংগীত ও ভাব* প্রবন্ধে গানে তালের প্রসঙ্গে বলেন-

"আমাদের সংগীতে নিয়ম আছে যে, যেমন- তেমন করিয়া ঠিক একই স্থানে সমে আসিয়া পড়িতেই হয়, সেটা উঠাইয়া দিলে ভালো হয়। তালের সমমাত্রা থাকিলেই যথেষ্ট, তাহার উপরে আরও কড়াক্কড় করা ভালো বোধ হয় না। তাহাতে স্বাভাবিকতার অতিরিক্ত হানি করা হয়। ... আমাদের সংগীতে কৃত্রিম তালের প্রথা ভাবের হস্তপদে একটা অনর্থক শৃঙ্খল

বাঁধিয়া দেয়। যাঁহারা এ প্রথা নিতান্ত রাখিতে চান তাঁহারা রাখুন। কিন্তু তালের প্রতি ভাবের যখন অত্যন্ত নির্ভর দেখিতেছি তখন আমার মতে আর-একটি স্বাভাবিক তালের পদ্ধতি থাকা শ্রেয়। আর কিছু করিতে হইবে না, যেমন তাল আছে তেমনি থাকুক। মাত্রা-বিভাগ যেমন আছে তেমনি থাকুক। একটা নির্দিষ্ট স্থানে সমে ফিরিয়া আসিতেই হইবে এমন বাঁধাবাঁধি না থাকিলে সুবিধা বই অসুবিধা দেখিতেছি না। এমনকি, গীতিনাট্যে, যাহা আদ্যোপান্ত সুরে অভিনয় করিতে হয় তাহাতে, স্থান বিশেষে তাল না থাকা বিশেষ আবশ্যক। নহিলে অভিনয়ের স্ফূর্তি হওয়া অসম্ভব।"[১৫]

সার্থক সঙ্গীতে সুর যেমন আবশ্যক তেমনি তালেরও সমান গুরুত্ব। কবিগুরু তালকেও ভাবপ্রকাশের বিশেষ মাধ্যম মনে করতেন। কারণ ভাবের পরিবর্তনের সাথে তালের লয়ের দ্রুত বা বিলম্বিত করা আবশ্যক। তিনি তাঁর রচিত গানগুলিতে ভাব ও সুরের প্রতি খেয়াল করে তালের ছন্দ বিভাগ করেছেন। প্রচলিত তালের ছন্দ গুলিকে গানের ভাব ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে ভাগ করে তালের নামকরণ করেছেন। যেমন- 'ধামার' তাল এর প্রচলিত ছন্দ ৫ ।২ ।২ ।৩ ।৪ । কবিগুরু তাঁর গানে এই তালের ছন্দকে ৩ ।২ ।২ ।৩ ।৪ ভাগে বিভক্ত করেছেন। এছাড়াও ঝম্পক, ষষ্ঠী, রূপকড়া, নবতাল, একাদশী, নবপঞ্চ নামে নতুন ছন্দে তালের নামকরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেমপর্যায়ের গানেও এসকল ছন্দের কিছু গান পাই। যেমন উদাহরণসরূপ কিছু গান-

- ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে। (ষষ্ঠী)
- আজি ঝড়ের রাতে। (ঝম্পক)
- কেন সারাদিন ধীরে ধীরে। (রূপকড়া)
- মনে কী দ্বিধা রেখে চলে গেলে। (২ + ২ মাত্রার ছন্দ)

সুতরাং বলতে পারি, কবিগুরুর প্রেমের গানের 'বাণী ও সুর' যেন কবির জীবনের সকল অভিজ্ঞতার পরিমিত সমন্বয় বোধের মিশ্রণে তৈরি এক অনন্য সৃষ্টি। 'সংগীত যে ভাবের বাহন' কবি যেন সেটাই প্রকাশ করতে চেয়েছেন তাঁর সঙ্গীতে। গানের বাণী, রাগ, তাল ও সুর কে আলাদা করে প্রাধান্য না দিয়ে সমন্বয় করেছেন কবির মনের ভাব প্রকাশে। নিজস্বতা তৈরী করেছেন তাঁর সঙ্গীতের। আর এখানেই কবির স্বার্থকতা।

তথ্যসূত্র

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সংগীতচিন্তা*, প্রকাশনা : বিশ্বভারতী, প্রকাশকাল : জ্যৈষ্ঠ ১৪১১, পৃ. ৯৪

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫

৫. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান (আধুনিক মন ও রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান)*, প্রকাশক : শ্রী সুভাষ চৌধুরী, প্রকাশকাল : বৈশাখ ১৩৯০, পৃ. ২, ৩

৬. অলোকরঞ্জন দাসগুপ্ত, *রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান (দ্বৈত পটভূমি : রবীন্দ্রসংগীতে প্রেম)*, প্রকাশক : শ্রী সুভাষ চৌধুরী, প্রকাশকাল : বৈশাখ ১৩৯০, পৃ. ২২

৭. সন্‌জীদা খাতুন, *রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান(কথা ও সুর)*, প্রকাশক : শ্রী সুভাষ চৌধুরী, প্রকাশকাল : বৈশাখ ১৩৯০, পৃ. ৩৫

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫, ৩৬

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সংগীতচিন্তা*, প্রকাশনা : বিশ্বভারতী, প্রকাশকাল : জ্যৈষ্ঠ ১৪১১, পৃ. ১২৪

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০, ১১

১২. প্রগুক্ত, পৃষ্ঠা : ২৪৫

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

১৪. সন্‌জীদা খাতুন, *রবীন্দ্রসংগীতে ভাবসম্পদ*, প্রকাশনা : প্রতীক, প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০১৩, পৃ. ১৫৪

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

চতুর্থ অথ্যায়

বাংলা প্রেমসঙ্গীতের ধারায় রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা

প্রেম মানবজীবনের গভীর বেদনার ও আনন্দের এক অনন্য রূপ। সঙ্গীত রচয়িতারা তাঁদের মনের এই মিশ্র প্রেমের অনুভূতিকে কথা ও সুরের মিশ্রণে সঙ্গীত রূপে আমাদের মাঝে যুগ যুগ ধরে প্রকাশ করে আসছেন। সকল সঙ্গীত রচয়িতারাই তখনকার প্রেক্ষাপটে তাঁদের নিজস্ব মনের অনুভূতি ও পারিপার্শ্বিক মনের ভাবকে পুঁজি করে গান রচনা করেছেন। সকলের মধ্যে অনেককে আমরা তাঁদের সার্থক রচনার দ্বারা স্মরণ করি। আবার অনেক রচয়িতারা কালের স্রোতে হারিয়ে গেছেন। বাঙালির মনের ভাব প্রকাশের একটি অন্যতম মাধ্যম হল গান। আর এই গানের মধ্য দিয়েই বাঙালির সর্বোত্তম পরিচয় ফুটে ওঠে। চর্যাপদের পূর্বে খোদাইকৃত চিত্রে নাচের অঙ্গভঙ্গি ও বাদ্যযন্ত্রের যে নিদর্শন পাওয়া যায় তা থেকে অনুমান করা হয় সেই সময়ও সঙ্গীতের চর্চা ছিল। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত গানের বাণীর বিভিন্ন বৈচিত্র্যের ভাবের মধ্যে 'পূজা ও প্রেম' প্রধান। তবে ঈশ্বর বন্দনায় পূজার গানের থেকে প্রেমের গানের প্রাধান্য সবথেকে অধিক। কারণ, ঈশ্বর বন্দনা কিংবা মানবপ্রেম যাই হোক না কেন তাতে রয়েছে রচয়িতার 'আনন্দ'। এই 'আনন্দ' 'বিরহ ও মিলনে' জাগতিক প্রাপ্তি কে ছাড়িয়ে নিজের মধ্যে যে সত্তা বা যিনি থাকেন তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পন করতে চায়। পূজার দ্বারা, প্রেমের দ্বারা মানুষ অন্যের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চায়। নিজেকে আলাদা সত্তা হিসাবে দেখতে আগ্রহ প্রকাশ করে না। তাই গভীর বেদনা আনন্দেরই এক রূপ।

আমাদের দেশে অসংখ্য কবির সঙ্গীত রচনার ইতিহাস আছে। তাঁদের মধ্যে বাংলা প্রেমসঙ্গীতের ধারায় রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন প্রাসঙ্গিকতা পায়। নির্মল প্রেমের গান যত পুরাতনই হোক আমাদের মনে এখনো আনন্দ দেয়। তার প্রধান কারণ কাব্যধর্মীতায় কথা ও সুরের অপূর্ব যুগলমিলন। যেমন-

"অতি প্রাচীন কাল থেকে সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় যতটা না বিকাশ দেখি তার চেয়ে অনেক বেশি দেখি কাব্য-সাহিত্যে। এবং এই সব কাব্য গানের সুরের দ্বারাই গীত হয়েছে। বৌদ্ধ যুগের চর্যাগীতি ছিল রাগরাগিণীর-তালমান-লয়-যুক্ত উচ্চাঙ্গের ধর্ম-সংগীত। জয়দেবের গীতগোবিন্দ, চণ্ডীদাসের পদাবলী ও চৈতন্যদেবের সময় থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী যুগের বৈষ্ণব গীতিকবিতা তো ছিল বিশাল প্রেমসংগীতের জগৎ। উচ্চাঙ্গের সংগীত রচনাকালে বাংলাদেশ সুরে ও ঢঙে বহু ক্ষেত্রে হিন্দী গানের কাছে বিশেষ ঋণী। কিন্তু কিভাবে নিজেদের ভাষার সঙ্গে তার মিলন ঘটিয়ে তাকে অন্য রূপে খাড়া করে নিয়েছে...।"[১]

বাংলা গানের ক্রমবিবর্তনের ধারাকে তিনটি প্রধান যুগে ভাগ করা হয়েছে এভাবে-

"খ্রিষ্টীয় ৮ম থেকে প্রায় ১৫ শতক পর্যন্ত 'চর্যাগীতি', 'গীতগোবিন্দ', বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ও 'মঙ্গলগীতির' কাল। এই কাল বা যুগকে বাংলা গান সৃষ্টির আদি পর্ব বলা যায়। চৈতন্যদেব, নানক, কবীর, তুলসীদাস, মীরাবাঈ প্রভৃতির

আবির্ভাবকালই বাংলাগানের মধ্যযুগ বা বাংলাগানের মধ্যপর্ব এবং রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, নিধুবাবু, দাশরথি, লালন, রাধারমন, হাসন রাজা প্রমুখজন থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুল প্রসাদ ও কাজী নজরুল ইসলাম পর্যন্ত যুগকে আধুনিক বা বাংলাগানের আধুনিক পর্ব বলে ধরে নিতে পারি।"[২]

বাংলা প্রেমসঙ্গীতের ধারায় রবীন্দ্রনাথের প্রেমপর্যায়ের গানের স্বকীয়তায় বাংলা গানের ধারায় ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত আলোচনায় সামগ্রিক বাংলা গানের প্রেমচেতনার রূপকল্পনা করা যাবে।

চর্যাগীতি :

চর্যা বৌদ্ধধর্ম সংগীত। ১৯৯২ সাল থেকে আট দশক পূর্বেও চর্যাগীতির কথা সকলের জানা ছিল না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে এই *গীতাবলী* সংগ্রহ করেন। হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় এর 'গান ও দোহা' লিপিবদ্ধ। প্রাচীন বাংলাগান বলতে এই গানগুলিকেই বোঝায়। এই গানগুলো এক প্রকার সাংকেতিক ভাষায় রচিত, যার নাম সান্ধ্যভাষা। সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের অনুষঙ্গগুলোই রচয়িতারা আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তু বোঝানোর কাজে রূপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। রূপকের ব্যবহার চর্যার রচনাকে কাব্যগৌরব দান করেছে। চর্যাপদে প্রেমের নিবেদন করছেন কবি এভাবে-

"তুলো ডোম্বী হউ কাপালী
তোহর অন্তরে মো এ ঘালিলি হাড়েড়ি মালী।

প্রণয়িনী যেখানে সমাজের অস্পৃশ্যা, প্রেমিক সেখানে কাপালিক না সেজে আর করবে কি! প্রিয়ার জন্য গলায় হাড়ের মালা প'রে সমাজ ত্যাগ করেছে সে। 'ওলো তুই যেমন ডোম্বী, আমিও তেমনি কাপালিক'। তোর জন্যই গলায় হাড়ের মালা ধারণ করেছি।"[৩]

প্রাচীনকালেও প্রেমের গানের বাণীতে আমরা অপূর্ব প্রেম নিবেদন পাই, কিন্তু এ ভাষা সকলের বোধগম্য নয়। কাব্যরস আহরণে বর্তমান সময়ের শ্রোতার কাছে চর্যাপদ বেশ কঠিন বিষয়।

গীতগোবিন্দ :

জয়দেব ও তাঁর পত্নী পদ্মাবতী উভয়ই ছিলেন সঙ্গীতে মহাপারদর্শী। জয়দেব '*গীতগোবিন্দে*'র রচয়িতা। তাঁর স্ত্রী নৃত্যেও পারদর্শী ছিলেন। তাঁরা দুজনে মিলিত ভাবে গীত ও নৃত্য সহকারে গীতগোবিন্দপদগান উপস্থাপন করতেন বলে জানা যায়। '*গীতগোবিন্দে*'র প্রধান তিনটি চরিত্র রাধা, কৃষ্ণ ও সখী। রাধা ও কৃষ্ণের লীলাকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছিল পদগুলি যা পরবর্তীতে বাঙালির কাছে বৈষ্ণব পদাবলী রূপে পরিচিত। পদগুলিতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রেমের অভিজ্ঞতা রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমলীলায় বর্ণনা করা হয়েছে। গীতগোবিন্দে পদের সংখ্যা

চব্বিশটি। পদগুলিতে কাব্য ও সঙ্গীতের যে সমন্বয় পাওয়া যায় তা আমাদের বাংলা সঙ্গীতের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন- "একটি পদে বলেছেন

(বসন্ত-রাগেন যতি তালেন চ গীয়তে)

ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে

মধুকর-নিকর-করম্বিত-কোকিল-কুজিত-কুঞ্জ কুটীরে।

বিহরতি হরিরিহ সরস-বসন্তে

নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং

সখি বিরহি-জনস্য দূরন্তে ॥"[৪]

পদগুলি মাত্রাবৃত্ত অপভ্রংশ ছন্দে-রচিত। রাগ বসন্ত ও যদি তালে নিবন্ধ।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন :

আমাদের দেশে বাউল গান, শিশুদের মন ভোলানো ছড়া লোকসাহিত্যের প্রধান বাহন। এতে যে ছন্দ ব্যবহৃত হয় তাকে বলি লোকরীতি। রবীন্দ্রনাথ একে বলেছিলেন 'বাংলা-প্রাকৃত' রীতি। বড়ু চণ্ডীদাস গ্রাম বাংলার লৌকিক কাহিনীকে রাধা কৃষ্ণের লীলায় বর্ণনা করেছিলেন বলে বলা হয়- বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। এটি বাংলার লোকায়ত জনগণের কাব্য তাই গ্রাম্য গোপবালক-বালিকার প্রণয় কাহিনী ও গ্রাম্য লোকায়ত জীবনের কথা ফুটে উঠেছে। কাব্যের প্রধান তিনটি চরিত্র- রাধা, কৃষ্ণ, বড়াই। সর্বমোট পদের সংখ্যা চারশত আঠারোটি (৪১৮)। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে রাধার মিলন ও বিরহের কথা পাওয়া যায় প্রেমের নানান উক্তি-প্রত্যুক্তির বিবরণে। এমনই একটি অংশে কৃষ্ণ বিরহে অধীর রাধা ভাব প্রকাশ করেছেন এভাবে-

নিন্দ এ চান্দ চন্দন রাধা সব খনে।

গরল সমান মানে মলয় পবনে ॥

পদাবলীতে বিভিন্ন রাগের নাম উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন- গুজ্জরী, কেদার, মল্লার, ভৈরবী, শ্রী, আহের, ভাটিয়ালী, দেশনাগ, পটমঞ্জুরী প্রভৃতি। তালের ক্ষেত্রে- যতি, একতালী, রূপক, আঠতালা প্রভৃতি উল্লেখ পাওয়া যায়। বড়ু চণ্ডীদাস জয়দেবের গীতগোবিন্দের মত পদের মধ্যবর্তী স্থানে ভনিতা না দিয়ে পদের শেষে ভনিতা দিতেন। যেমন-

... না পরিহর রাধা কাহ্নের বচন।

গাইল বড়ুচণ্ডীদাস বাসলীগন ॥

গীত গোবিন্দে রাধা-কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-বড়াই, রাধা-বড়াই প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে কাহিনীর বর্ণনায় পদগুলি সমাপ্তি ঘটে।

বিদ্যাপতির পদাবলী :

বিদ্যাপতি আনুমাণিক ১৩৫০ থেকে ১৩৬০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শৈব ছিলেন। তাঁর রচিত বৈষ্ণব পদগুলি মূলত মানবিক প্রেমের ছিল, যেখানে প্রেম দেহকে অস্বীকার করে না। আবার দেহাশ্রিত প্রেমই যে শ্রেষ্ঠ

তাকেও তিনি পুরোপুরি সমর্থন করেননি। তাঁর রচিত পদগুলি মূলত দেহ ও অন্তর এই দুয়ের সমন্বয়ে রচিত। রবীন্দ্রনাথ যেমন জয়দেবের কাব্যে মুগ্ধ ছিলেন, তেমনি তিনি বিদ্যাপতির কাব্যগুলি দ্বারা ভীষণ ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। তিনি বিদ্যাপতির- 'ভরা বাদর-মাহ বাদর' পদটি সুরারোপ করেছিলেন। বিদ্যাপতি তাঁর পদগুলিও বিভিন্ন রাগরাগিণী ও তালে রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গানে যেমন পাওয়া যায় প্রিয়ের স্বপনে আগমন। তেমনি বিদ্যাপতির পদেও তিনি বলেছেন-

"সখি আমার প্রিয় স্বপ্নে আমার পাশে এসেছিল। তখনকার হৃদয়োল্লাসের কথা আর কি বলব। ধনুর্গুন দেখলাম না, তার সন্ধানও দৃষ্টিগোচর হল না, কিন্তু চতুর্দিকে কুসুমসর পড়তে লাগল। ... আলিঙ্গন কালে চেতনা পেয়ে জেগে উঠলাম এবং শূন্য শজ্জা দেখে লজ্জা অনুভব করলাম। বিদ্যাপতি বলছেন- শোনো, তুমি স্বপনে যা দেখলে তাতেই মনপরিপূর্ণ হয়ে গেল। ষোড়শ মাত্রিক ছন্দে পদটির কিছু অংশ

সপনে আত্রল সখি মুঝপিঅ পাসে।
তখনুক কী কহব হৃদয় হুলাসে॥
ন দেখিঅ ধনুর্গুণ ন দেখু সন্ধানে
চৌদিস পরত্র কুসুমসর কনে ॥..
.. ভনই বিদ্যাপতি সুনহ সপনে।
জত দেখলহ তত পুরতৌহ মনে ॥"[৫]

বৈষ্ণব পদাবলী :

বৈষ্ণব পদাবলীর আদি কবি ছিলেন জয়দেব। চৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রি.) আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই এই গানের সূচনা ঘটে। বৈষ্ণবদের গান মূলত রাধা-কৃষ্ণের লীলাকে কেন্দ্র করে। যেখানে, রাধা, কৃষ্ণ, সখি, বড়াই চারজনের কথোপকথনের মধ্য দিয়েই গানগুলি রচিত হয়। বৈষ্ণবপদাবলীর রচনার প্রাথমিক পর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীতে আর এর স্বতঃস্ফূর্ত ধারাবাহিকতা গতি পায় ষোড়শ শতাব্দীতে লৌকিক ও মানবিক প্রেমানুভূতি, সেই সাথে প্রেমের আনুষাঙ্গিক সূক্ষ্ম অনুভূতির মিশ্রণে বৈষ্ণব পদাবলী স্থান হয়েছিল মানুষের মনে ও বিশ্বসাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর *ভানুসিংহের পদাবলী* বৈষ্ণব পদ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে রচনা করেছিলেন। চৈতন্যপূর্ব যুগে জয়দেব এবং বাংলার চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, হোসেন শাহ, মালাধর বসু প্রমুখ ছিলেন রাধা কৃষ্ণ লীলার পদকার। পদাবলীতে কৃষ্ণ লীলার মাধ্যমেই বাঙালির ঘরে এই ধারার প্লাবন প্রবাহিত হতে থাকল। ফলে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে বাংলা 'সাহিত্য ও সঙ্গীতে' ঘটেছিল নতুন জোয়ার। বাঙালি বৈষ্ণব প্রেমবাদের মধ্য দিয়ে নরে-নারায়ণ ও জীবে-ব্রহ্ম দর্শনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়। এই সকল প্রীতিধর্মের প্রভাবে তাঁদের মধ্যে ভীষণ ভাবে মানবিকতা বা মানবতাবোধ জাগ্রত হয়। তাই এই সময়কে বাংলা সাহিত্যের রেনেসাঁসের যুগ বলা হয়। বৈষ্ণব মতবাদ দ্বারা 'সহজিয়া ও বাউল' মতবাদ প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয়।

কীর্তন :

শ্রী চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩) কীর্তনের বিশেষরূপ দান করেন। কীর্তন বলতে বোঝায়, ঈশ্বরের নাম, লীলা ও গুণাদির উচ্চভাষণ। চৈতন্যদেব কীর্তন কে নাম সংকীর্তন ও রস বা লীলা কীর্তন নামে দুটি পদ্ধতির চালু করেন। হিন্দুস্তানী রাগসঙ্গীতের উপাদানের সঙ্গে বাংলার আঞ্চলিক সঙ্গীতের উপাদান মিশ্রণে কীর্তন সঙ্গীত বাংলায় এক মনোরম ধারা সৃষ্টি করেছিল।

কীর্তনের কথা দোহা, আখর, তুক ও ছুট এই পাঁচটি অঙ্গ রয়েছে। কথা বলতে গানের ভাষাকে বোঝায়। দোঁহা বলতে বোঝায় শ্লোক ভঙ্গিম রচনা, যেগুলি কীর্তনীয়াগণ আবৃত্তি করেন। আখর কীর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'কথার তান'। তুক হল অনুপ্রাস বহুল ছন্দোময় মিলনাত্মক গাথা এবং পরিশেষে ছুট বলতে বোঝায় তাল বা পদের অংশ বিশেষকে। আধুনিক পর্বের সকল সঙ্গীত রচয়িতারা কীর্তনের সুরের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। নাম সংকীর্তনে যেমন ঈশ্বরের নাম গান গুনকীর্তন করা হয়, তেমনি লীলা কীর্তনে মূল বিষয় হল 'প্রেম'। এই প্রেমকেই হৃদয়ে সঞ্চার করাই বৈষ্ণব সাধকদের মূখ্য উদ্দেশ্য। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস বৈষ্ণব কবিতার দুইজন দিক পাল। তাঁদের সর্ম্পকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন–

"বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডিদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগত বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি, চণ্ডীদাস সহ্য করিবার কবি।-বিদ্যাপতির অনেকস্থলে ভাষার সৌকর্য বণর্নার মাধুর্য আছে, কিন্তু চণ্ডীদাসের নতুনত্ব আছে, ভাবের মহত্ব আছে, আবেগের গভীরতা আছে।"[৬]

চণ্ডীদাস বলেন সুখের জন্য যে প্রেম সে প্রেমের প্রাপ্তি দুঃখ। সুখ ও দুঃখ কে দুই ভাই হিসাবে উচ্চারণ করে গানে বলেছেন–

কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনী
সুখ দুখ দুটি ভাই–
সুখের লাগিয়া যে করে পিরিতি
দুখ যায় তার ঠাঁই ॥

কীর্তন ভেঙে বাংলায় যে ঢপ্ কীর্তনের সৃষ্টি হয় তার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের গানে লক্ষ্য করা যায়। আখরবিহীন এই কীর্তনে সহজ সুর ও তালে গাওয়া হতো। কীর্তনে রাগসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীত উভয় উপাদানের মিশ্রণে রচিত পদাবলী কীর্তন। বাংলা গানের 'কথা ও সুরের' মিলনে যে কাব্যধমীর্তা, তা পাই এই কীর্তনে। রবীন্দ্রনাথ কীর্তন সম্পর্কে বলেন–

"কীর্তনসংগীত আমি অনেক কাল থেকেই ভালোবাসি। ওর মধ্যে ভাবপ্রকাশের নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি আছে। সে আর-কোনো সংগীতে এমন সহজভাবে আছে বলে আমি জানি নে। সাহিত্যের ভূমিতে ওর উৎপত্তি, তার মধ্যেই ওর

শিকড়, কিন্তু ও শাখায় প্রশাখায় ফলে ফুলে পল্লবে সংগীতের আকাশে স্বকীয় মহিমা অধিকার করেছে। কীর্তনসংগীতে বাঙালির এই অনন্যতন্ত্র প্রতিভায় আমি গৌরব অনুভব করি।... কখনো কখনো কীর্তনে ভৈরোঁ প্রভৃতি ভোরাই সুরেরও আভাস লাগে, কিন্তু তাঁর মেজাজ গেছে বদলে– রাগরাগিণীর রূপের প্রতি তার মন নেই, ভাবের রসের– প্রতিই তার ঝোঁক। আমি কল্পনা করতে পরি নে হিন্দুস্থানি গাইয়ে কীর্তন গাইছে, এখানে বাঙালির কণ্ঠ ও ভাবার্দ্রতার দরকার করে। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও কি বলা যায় না যে এতে সুরসমবায়ের পদ্ধতি হিন্দুস্থানী পদ্ধতির সীমা লঙ্ঘন করে না? অর্থাৎ য়ুরোপীয় সংগীতের সুরপর্যায় যে রকম একান্ত বিদেশী, কীর্তন তো তা নয়। ওর রাগরাগিণীগুলিকে বিশেষ নাম দিয়ে হিন্দুস্থানী সংগীতের সংখ্যা বৃদ্ধি করলে উপদ্রব করা হয় না। কিন্তু, ওর প্রাণ, ওর ভঙ্গিঁ সম্পূর্ন স্বতন্ত্র।"[৭]

রবীন্দ্রনাথসহ পঞ্চকবির অন্যান্য কবিরাও কীর্তনের সুরদ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

মঙ্গলকাব্য, পাঁচালী, শাক্তপদাবলী, কবিগান ও যাত্রাগান :

মঙ্গলকাব্য হল আখ্যায়িকা কাব্য। দেবতাদের অবলম্বন করে রচিত হয় কাব্য। জীবনের নানান আশা, আকাঙ্ক্ষা, বিপর্যয়, জীবিকার ইত্যাদির চাওয়া পাওয়া গুলি কাব্যের বিষয়বস্তু। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মঙ্গলকাব্যের যুগ। পৌরাণিক ও লৌকিক দেশজ কাহিনী অবলম্বনে মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত ছিল।

পাঁচালী মূলত বাংলাকাব্য ছিল, যা কথকতার মাধ্যমে প্রচলিত ছিল। ঊনবিংশ শতকে দাশরথি রায় (১৮০২ - ১৮৫৭) পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে নতুন ধরণের পাঁচালী রচনা করেন। যেমন–

ওরে রে লক্ষণ একী কুলক্ষণ
জানকীরে দিয়ে এসো বন ॥

শাক্তপদাবলী হল 'কথা ও সুরে' ঈশ্বরের কাছে শক্তি সাধনার রূপ। সতের (১৭০০ খ্রিঃ) শতাব্দীতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার প্রভাব ছেড়ে মাতৃশক্তি উপাসনার ধারা চালু হয়েছিল। শাক্তপদাবলী সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ রচয়িতা রামপ্রসাদ সেন (১৭২০-১৭৮১)। পরবর্তীতে এই ধারা কবিয়াল, পাঁচালীকার হয়ে রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি আধুনিক কবি কে প্রভাবিত করেছিল। পঞ্চকবির সর্বকনিষ্ঠ কবি নজরুল ইসলামের 'শ্যামা' সঙ্গীত রচনার মধ্যদিয়ে এর পরিণতি লাভ করেছিল।

কবি গান হলো দুই প্রতিদ্বন্দ্বী কবির সুর ও তাল সহযোগে পদ্যরচনার মাধ্যমে 'চাপান ও উত্তর' রচনা করে লড়াই। কবিগান সর্ম্পকে রবীন্দ্রনাথ বলেন–

"ইংরেজদের নতুন সৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক (Mass) এক অপরিণত স্থূলায়াতন ব্যক্তি এবং সেই হঠাৎ রাজার সভার উপযুক্ত গান হইল কবিদলের গান। তখন যথার্থ সাহিত্য-রস আলোচনার অবসর, যোগ্যতা, এবং ইচ্ছা কয়জনের ছিল? তখন নতুন রাজধানীর নতুন সমৃদ্ধশালী কর্মশ্রান্ত বণিকসম্প্রদায় সন্ধাবেলায় বৈঠকে বসিয়া আমোদের উত্তেজনা চাহিত- তাহারা সাহিত্য-রস চাহিত না।"[৮]

যাত্রাগান পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের জনপ্রিয় লোকনাট্যধারা। বাংলাদেশে ষোড়শ শতাব্দীতে যাত্রাগানের উদ্ভব হয়। প্রাচীনকালে দেবমাহাত্ম্যের কাহিনী যাত্রাগানে ব্যবহৃত হত। ইংরেজ রাজত্বে সময়কালে সামাজিক কাহিনীকে অবলম্বন করে যাত্রাগান গীত ও অভিনয় হয়েছে। সে সময় যাত্রাগানে সুসাহিত্যের উপাদান অভিজাত সঙ্গীতের নিদর্শন ছিল। কিন্তু কালের স্রোতে সময় ও সমাজের চাহিদার প্রাধান্য দিতে গিয়ে এটি এর আভিজাত্য হারায়। বর্তমানে যাত্রা গানের প্রচলন সঠিক পৃষ্ঠপোষকতা ও কাব্যমূল্যের অভাবের কারণে প্রায় বিলুপ্তির পথে। বাংলা গানের ধারায় এ সকল সঙ্গীতের ও অবদান রয়েছে আমাদের বাংলা গানের বিপুল সম্ভারে।

বাউল গান :

উনিশ শতকের পূর্বে বাউল গানের প্রচলন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। তখনকার গুরু শিষ্য পরম্পরার কারণে 'স্মৃতি ও শ্রুতি' অবলম্বন করেই বাউল গানের ধারা প্রবাহমান ছিল বলে মনে করা হয়। উনিশ শতকে লালন ফকিরের আবির্ভাবের মাধ্যমেই বাউল গানের জনপ্রিয়তা ও পূর্ণ বিকাশ ঘটে। সেই সময় কাঙাল হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-১৮৯৬), ফিকির চাঁদ নামে যিনি অধিক পরিচিত তিনি সকলের নিকট জনপ্রিয় ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় সঙ্গীতটি তাঁর গানের সুর দ্বারা প্রভাবিত হয়েই রচনা করেছিলেন। বাউলরা সহজ ও সরল ভাষায় তাঁদের মনের কথা বলে গিয়েছেন। ভাবতেও অবাক লাগে যাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার জ্ঞান ছিল না তাঁরা কিভাবে এত সহজে গ্রাম বাংলার মানুষের গভীর তত্ত্বের কথা সহজ ভাষায় ও সুরে প্রকাশ করে গেছেন।

বাউলসঙ্গীত বাংলা গানের ধারায় একটা বিশাল অংশ জুড়ে নানান বৈচিত্র্যের সম্ভারে আমাদের মাঝে বিরাজমান। রবীন্দ্রনাথ বাউলদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে তাঁদের দর্শন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, পরবর্তীতে তিনি নিজেকে 'রবীন্দ্র বাউল' বলেছেন। লালনের পরবর্তী অনেক বাউল সাধক যেমন– গগণ, দুদ্দুশা, পাগলা কানাই, রাধারমন, মদন, শা'নূর, সাহাবুদ্দীন, হাসানরাজা প্রভৃতি মরমিয়া সাধক তাঁদের নিজস্ব ভাবধারায় এই বাউল সঙ্গীতকে গতিময় করে নিয়ে চলেছেন। বাউলরা প্রেমের মহিমা অসম্ভব নৈপুণ্যের সাথে প্রকাশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে বাউল গান সর্ম্পকে তাঁর মতামতের কিছু অংশ তুলে ধরলাম–

"... বাংলা ভাব ও ভাবের ভাষা যতই সংগ্রহ করা যাইবে ততই আমাদের সাহিত্যের উপকার হবে তাহাতে সন্দেহ নাই।... আধুনিক ইংরেজি কবিতায় মনের মানুষের জন্য প্রাণের ব্যাকুলতা প্রায়ই পড়িতে পাওয়া যায়।...

দেখেছি রূপ-সাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা,
তারে ধরি ধরি মনে করি ধরতে গেলেম আর পেলাম না।.....
.....একবার ধরতে পেলে মনের মানুষ, ছেড়ে যেতে আর দিয়ো না।

Universal love প্রভৃতি বড়ো বড়ো কথা বিদেশীদের মুখ হইতে বড়োই ভালো শুনায়, কিন্তু ভিখারীরা আমাদের দ্বারে দ্বারে সেই কথা গাহিয়া বেড়াইতেছে, আমাদের কানে পৌঁছায় না কেন?–

আয় রে আয়, জগাই মাধাই - আয়!...

...ওরে মেরেছ কলসীর কানা,

তাই বলে কি প্রেম দিব না - আয়!

বাউল বলিতেছে–

সে প্রেম করতে গেলে মরতে হয়।

আত্মসুখীর মিছে সে প্রেমের আশয়।

গোড়াতেই মরা চাই। আত্মহত্যা না করিলে প্রেম করা হয় না।

(পূর্বেই আর একটি গানে বলা হইয়াছে–

যার আমি মরেছে, তার সাধন হয়েছে

কোটি জন্মের পূণ্যের ফল তার উদয় হয়েছে।)

তারপর বলিতেছে–

যে প্রাণ ক'রে পণ পরে প্রেমরতন

তার থাকে না যমের ভয়।

যে মরে তার আর মরণের ভয় থাকে না। জগৎকে সে ভালোবাসে, এই জন্য যে জগৎ হইয়া যায়, সে একটি অতি ক্ষুদ্র 'আমি' মাত্র নহে যে যমের ভয় করিবে বিশ্বচরাচর।"[৯]

তিনি আরও বলেন–

"বাউল বলিতেছে সমস্ত জগতের গান শুনিবার এক যন্ত্র আছে–

ভাবের আজগবি কল গৌরচাঁদের ঘরে

সে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের খবর, আনছে একতারে,

গো সখি, প্রেম-তারে।

প্রেমের তারের মধ্যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের তড়িৎ খেলাইতে থাকে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খবর নিমেষের মধ্যে প্রাণের ভিতর আসিয়া উপস্থিত হয়। যাহাকে তুমি ভালোবাস তাহার কাছে বসিয়া থাক, অদৃশ্য প্রেমের তার দিয়া তাহার প্রাণ হইতে তোমার প্রাণে বিদ্যুৎ বহিতে থাকে, নিমেষে নিমেষে তাহার প্রাণের খবর তোমার প্রাণে এসে পৌঁছায়। তেমনি যদি জগতের প্রাণের সহিত তোমার প্রাণ প্রেমের তারে বাঁধা থাকে, তাহা হইলে জগতের ঘরের কথা সমস্তই তুমি শুনিতে পাও। প্রেমের মহিমা এমন করিয়া আর কে গাহিয়াছে।"[১০]

বাউলের এই ভাব দর্শন দ্বারা পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ সহ অন্যান্য আধুনিক সঙ্গীত রচয়িতারাও প্রভাবিত হয়েছেন।

নিধুবাবুর টপ্পা :

আধুনিক বাংলা গানের প্রেরণাদাতা ও টপ্পার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নিধুবাবু (১৭৪১-১৮৩৯)। টপ্পার উদ্ভব হয় হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বিখ্যাত কেন্দ্র লখনৌয়। পাঞ্জাব থেকে বাণিজ্যিক কাজে সেখানে ব্যবসায়ীরা উট নিয়ে

আসতেন। ধারণা করা হয়, পাঞ্জাবের উট চালকদের একটি প্রচলিত গীতিরীতির মাধ্যমে টপ্পা গানের বিকাশ ঘটে। অষ্টদশ শতকের শেষভাগ ও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত রাগসঙ্গীত চর্চার সূচনালগ্নে টপ্পার প্রচলন শুরু হয়। রাগসঙ্গীতের টপ্পা ও পশ্চিমী টপ্পা, কম্পমান সুর বা দোলায়িত সুরের মূল আদর্শে নিধুবাবু টপ্পা গান রচনা করেছেন।

নিধুবাবুর পূর্বে সঙ্গীত রচনার ধারা ভক্তিভাবে প্রবাহিত ছিল। কিন্তু নিধুবাবু বেছে নেন গোলাম নবীর (১৭৪২ - ১৭৯২) প্রেমের গানের ধারা। প্রায় ছয়শত গান রচনা করেছিলেন নিধুবাবু। তাঁর গান রচনার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল নরনারীর ভালোবাসা। তিনিই সর্বপ্রথম সকল প্রকার আধ্যাত্মচিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে 'কথা ও সুরে' মিলনে কাব্যধর্মীতায় মানবীয় প্রেমের গান রচনা করেন। বৈষ্ণব ধারার পদগুলিতে প্রেমের বাণী থাকলেও তা ছিল গভীর আধ্যাত্মিক পটভূমিতে রচিত সঙ্গীত। কিন্তু নিধুবাবুর গান সকলের হৃদয়াবেগ ও একান্ত রোমান্টিক চেতনার প্রকাশ। তিনি মূল টপ্পার সুরের যে দোলায়িত কম্পন সেটাকে গ্রহণ করে বিষয়বস্তুর পরিবর্তন করে টপ্পা গান রচনা করেন। নিধুবাবুর ব্যক্তি জীবনে নানান দুঃখ বোধ সহ্যকরে জীবন অতিবাহিত করেছেন। ফলে তার রচিত টপ্পা গান যেন বেদনার সঙ্গীত। সে সময় তৎকালীন সমাজে নারী পুরুষের মধ্যেও কেমন একটা বিচ্ছেদ যন্ত্রণা ছিল। সমাজের এই বিচ্ছেদের দুঃখের কথাও তাঁর কাব্যরচনার প্রেরণা হয়েছিল। রামাকান্ত চক্রবর্তী এ প্রসঙ্গে বলেন–

"নিধুবাবুর গানে করুণরসই প্রধান। মিলনের গান তিনি বেশী রচনা করেন নি। বাংলা কবিতার ইতিহাসে বিরহ বেদনার অবাধ প্রকাশ নূতন নয়। পদাবলীর একটি বড়ো অংশই বিরহের গান।...নিধুবাবুর গানের বিরহ বিচ্ছেদজাত দুঃখ ছিল বাস্তব ও সামাজিক।"[১১]

নিধুবাবুর টপ্পা-

কি যাতনা যতনে মনে মনে মনই জানে,
পাছে লোকে হাসে শুনে, লাজে প্রকাশ করিনে।...

আবার প্রেমের ভাব প্রকাশ করছেন এভাবে-

তবে প্রেমে কি সুখ হত,
আমি যারে ভালবাসি, সে যদি ভালবাসিত...

নিধুবাবুর রচনায় রোমান্টিকতার উদ্ভব সম্পর্কে গুণীজনের মতামত এমন-

"সংগীতের মধ্যে ব্যক্তিগত চেতনাকে প্রাধান্য দান করে গীতিকবিতা বা লিরিকের আবেগে কাব্যসংগীত রচনার ইতিহাস নিধুবাবু সৃষ্টি করেন এবং তাঁর পরবর্তী উত্তরসাধকদের হাতেই গড়ে উঠল আমাদের কাব্যসাহিত্যের বিপুল ঐতিহ্য। সেই ইতিহাসের দিক থেকে তার মূল্যায়ন করার প্রয়োজন আছে। যদি মন্ময়তা এবং সৌন্দর্যব্যাকুলতা, ব্যক্তিগত আবেগ ও ললিত প্রকাশরীতি রোমান্টিক গীতিকবিতার লক্ষণ হয়, তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, বিহারীলালের পূর্বে রামনিধি গুপ্তই বাঙলা সাহিত্যের প্রথম লিরিক রচয়িতা, তাঁর মধ্যেই আধুনিক যুগের রোমান্টিক চেতনার একটি সার্থক

বিকাশ ঘটেছিল। নিধুবাবু বাঙলা গীতিকবিতার ধারায় এমন একটি পরমাশ্চর্য বিস্ময়রূপ আবির্ভূত হয়েছিলেন যে উনিশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত বাংলাদেশে এমন গীতিকারের সাক্ষাৎ মেলে না যাঁর উপর নিধুবাবুর প্রভাব পড়েনি।"[১২]

নিধুবাবুর পরে টপ্পা রচনায় খ্যাতি লাভ করেছিলেন- শ্রীধর কথক (১৮২৮-?) কালী মির্জা (১৭৫০-১৮২০), রঘুনাথ রায় (১৭৫০-১৮০৬) ও রাম শংকর ভট্টাচার্য (১৭৬১ -১৮৫৩)। পরবর্তীতে পঞ্চকবি হিসাবে খ্যাত রবীন্দ্রনাথ থেকে নজরুল সকলেই টপ্পার সংগীত দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিধুবাবুর টপ্পা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সুপরিমিত ভাবে তাঁর রচিত গানে টপ্পারীতির প্রয়োগ করেছিলেন। যেমন-

"নিধু বাবুর রচিত টপ্পা-

কে ও যায় চাহিতে চাহিতে
ধীর গমন অতি হাসিতে হাসিতে

রবীন্দ্রনাথের তুলনীয় রচিত টপ্পা-

ও কেন চুরি করে যায়
নুকোতে গিয়ে হাসি হেসে পালায় ॥

আবার, কবিগুরু টপ্পার সুর ও গায়নরীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে 'রাজা' নাটকের গান- 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না' বা 'অচলতায়তনে'-'যা হবার তা হবে' ইত্যাদি গান রচনা করেন।"[১৩]

ধ্রুপদ, ব্রহ্মসংগীত ও প্রীতিগীতি :

নিধুবাবুর টপ্পা গানের প্রচলনের পর রাগসঙ্গীতের অন্যান্য শাখা খেয়ালে রঘুনাথ রায় (১৭৫০-১৮৩৬) ও ধ্রুপদে রাম শঙ্কর ভট্টাচার্য (১৭৬১-১৮৫৩) বাংলায় এই দুই অঙ্গের গান রচনা করলেন। ঈশ্বর বন্দনার সঙ্গীত ছিল এই দুইধারা। ঠাকুরবাড়িতে বিষ্ণু চক্রবর্তী (১৮০৮-১৯০০) সংগীতাচার্য ছিলেন। কবিগুরু কৈশোরের নানান বিখ্যাত ধ্রুপদ ও খেয়াল গায়কের সংস্পর্শে এসে এসব হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের বিভিন্ন ধারার গান শুনে বেড়ে ওঠেন। তাই প্রথম জীবনের সঙ্গীত রচনায় এসকল ধারার গানের প্রভাব বেশি।

ব্রাহ্মধর্মের মত ও ব্রাহ্মসমাজ ধারার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) তিনি ঈশ্বর সাধনায় ছিলেন বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্য ধর্মের পূজারী। ব্রহ্মসংগীতগুলির বাণীতে ঈশ্বর ভক্তির প্রকাশ পেত। তবে পূর্বে উপাসনায় বা ঈশ্বর ভক্তিতে পৌত্তলিকতা ছিল, যা ব্রহ্মসংগীতে ভাবে বর্জনীয়। এই সঙ্গীতধারা আমাদের বাংলা গানের ইতিহাসে একটি অনন্য তাৎপর্যময় ঘটনা।

প্রীতিগীতির মূল বিষয়বস্তু প্রেম। অষ্টাদশ শতকের গীতরচয়িতা রাসু (১৭৩৫-১৮০৭), নৃসিংহ (১৭৩৮-১৮০৭), হরঠাকুর (১৭৩৮-১৮১২), রাম বসু (১৭৩৬-১৮২৮) প্রমুখ জনরা রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা থেকে প্রেমকাহিনীকে নগরবাসী মানুষের জীবনের সামনে দাঁড় করিয়ে ছিলেন। তাঁরা প্রেমসঙ্গীতকে মানুষের হৃদয়ের সঙ্গীত করে তুলেছিলেন। নরনারীর প্রেমে নিধুবাবু যে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি করেছিলেন তার প্রতিফলন পরবর্তীতে শ্রীধর

কথকের গানে এভাবে পাই-

ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে
আমার স্বভাব এই তোমা বই জানিনে।
বিধুমুখে মধুর হাসি আমি বড় ভালবাসি
তাই তোমারে দেখতে আসি দেখা দিতে আসিনে।

পরবর্তীতে বিহারীলাল চক্রবর্তীর আগমনে প্রেমের গানে প্রকৃতির সংযোগ ঘটিয়ে তিনি ব্যক্তিচিত্তের অপরূপ সঙ্গী করে তোলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে বলেন-

"একথা বলিতে পারি আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সংগীত এরূপ সহস্রধার উৎসের মতো কোথাও উৎসারিত হয় নাই। এমন নির্মল সুন্দর ভাষা, এমন ভাবের আবেগ, কথার সহিত সুরের এমন মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না।"[১৪]

বাংলা গানের রাগসঙ্গীতের বিভিন্ন ধারা- টপ্পা, ব্রহ্মসংগীত, কীর্তন, বাউল বিভিন্ন 'কথা ও সুরে'র গান দ্বারা বাংলাগান একটি অবকাঠামোয় দাঁড়ালো। যেখানে আধুনিক পর্বের সকল রচয়িতারা এসকল সঙ্গীতে রস আহরণ করে নিজেদের মত করে নতুন ধারায় সঙ্গীত রচনা করলেন। প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কালের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা প্রেমসঙ্গীতের ধারা ভীষণ সুন্দর একটি মানবীয় প্রেমের ধারা সূচনা করেছিল। পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯৩১), রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০), অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪), নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) প্রমুখ সঙ্গীতকারদের রচনায় প্রেমের গান সুরবৈচিত্র্য ও কাব্যমাধুর্যে নবরূপে প্রকাশ পেয়েছে। এ সকল ধারায় রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানের ভাব, সুর ও কথায় আমরা প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিদের রচনার প্রভাব পেয়েছি। পঞ্চকবির বাকি পাঁচ কবির প্রেমের গানের রূপ কেমন সেটা নিরূপণ করতে পারলে রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানের স্বকীয়তা আরও স্পষ্টতর হবে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় :

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯৩১) রচিত কাব্যগীতিগুলোকে দেশাত্মবোধক, হাসির গান, ভক্তিগীতি ও মানব প্রেমগীতি এই চার ভাগে ভাগ করা যায়। আর্যগাথা দ্বিতীয় ভাগে প্রেমে লঘু রূপটি হাসির গানে প্রকাশ পায়। নরনারীর চিরন্তন প্রেমকে তিনি হাস্যরসের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন এভাবে-

প্রথম যখন বিয়ে হল ভাবলাম বাহা বাহারে
কিরকম যে হয়ে গেলাম বলবো তাহা তাহারে!..

আবার-

তারেই বলে প্রেম
যখন থাকে না future এর চিন্তা, থাকে না shame
যখন বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ, যখন past all surgery

আর তখন past all hope-

তারে ভিন্ন জীবন ঠেকে যখন ভারি tame

তারেই বলে প্রেম।

গানগুলিতে হাস্যরসের আড়ালে মানবজীবনের নিষ্ঠুর সত্য কথাটি প্রকাশ পায়। গভীর বেদনায় একে অপরের সুখ-দুঃখ ভাগ করে নিতে তিনি বলেছেন এভাবে-

হাস্য শুধু আমার সখা, অশ্রু আমার কেহ নয়!

হাস্য করে অর্ধজীবন করেছি তো অপচয়।

চলে যা রে সুখের রাজ্য, দুঃখের রাজ্য নেমে আয়

গলা ধরে কাঁদতে শিখি, গভীর সহবেদনায়।

ডি.এল রায়ের মানব প্রেমেরগান একান্ত ঘরোয়া প্রেম। যেমন কিছু এমন গানের উদাহরণ-

- আজি তোমার কাছে ভাসিয়া যায় অন্তর আমার।
- মলয় আসিয়া কয়ে গেছে কানে।
- এস প্রাণসখা, এস প্রাণে।
- আজি এসেছি, এসেছি এসেছি বধুঁ হে
  নিয়ে এই হাসি রূপ গান।
- তুমি যে হে প্রাণের বঁধু আমরা তোমায় ভালবাসি।
- বরষা আইল ওই ঘনঘোর মেঘে।

কবির অত্যন্ত প্রখর ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও বস্তুজগতের ক্ষুদ্রতর বিষয়গুলো গভীরভাবে উপলব্ধির দ্বারা গানের ভাবে, প্রেমের-ব্যর্থতা, প্রতীক্ষা, হতাশা, প্রকৃতির বরষায় প্রিয়তমের প্রতীক্ষা, হৃদয়ানুভূতির গোপন প্রয়াস ইত্যাদি প্রকাশ পায়।

আবার কিছু গানে কবি জীবন মৃত্যুর মাঝখানে দণ্ডায়মান প্রেমে যেমন 'সাঙ্গ আমার ধুলো খেলা, সাঙ্গ আমার বেচাকেনা', 'ঘরের ছেলে পরের কাছে পড়ে আছিস পরবাসে' প্রভৃতি। কবির কাব্যরচনায় সার্থকতা হল মানবপ্রেম গীতিগুলো। তিনি তাঁর প্রেমের গানগুলিকে গদ্যধর্মী ভাষায় কাব্যরূপ দিয়েছেন। তাঁর প্রেমভাবনা সম্পর্কে গুণীজনের মতামত এমন-

"বিষয়বস্তুতে অভিনবত্বের অভাব বিশেষ করে মানব-প্রেমভাবনামূলক কাব্যগীতি রচনায় কবি প্রথানুগ প্রেমচিত্র অঙ্কনেই আগ্রহী। স্বাভাবিক এবং একান্ত পরিচিত জীবনানুরাগের গণ্ডিতেই কবি ভাবনা সীমায়িত। পাপিয়ার আকুল তান, জ্যোৎস্না বিকশিত শর্বরী, সুন্দর শশধর, কুহু কুহু কোকিল তান, স্বর্গের কিরণ, চাঁদের হাসি, মলয় বাতাস, কুসুমের মধু, কেতকী সুবাস, স্মিমিত নয়ন, মর্মমুকুর, নিহিত ব্যথা, নিহিত যাতনা, বিম্বাধরে সুধারাশি, আধ নিমীলিত আঁখি, মধুর

Dhaka University Institutional Repository

নিগড়, এলোচুল, নিরাশার শ্বাস, হৃদয়ের ভার, অসীম তাচ্ছিল্য ভরা, ইত্যাদি আমাদের একান্ত পরিচিত প্রকৃতিচিত্র এবং মানবপ্রেমাকাঙ্ক্ষার রূপ কাব্যসংগীতে ধরা পড়েছে।"[১৫]

কবির গানের প্রেমের গানের অপর একটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় তা হল নাটকীয়তা। যেমন কিছু গানের উদাহরণ-

- আয়রে বসন্ত ও তোর কিরণ মাখা পাখা তুলে।
- তুমি যে হে প্রাণের বঁধু।
- একটু আলো ও আঁধার একটু সুখ ও একটু ব্যথা।

তার রচনায় কাব্যের ভাষার ও ছন্দের একটি স্বাধীনতা প্রকাশ পায়। কথার নিজস্ব ভঙ্গিমায় গানগুলি নাটকীয়তার দাবী রাখে। প্রেমের গানে টপ্পা অঙ্গের গান, হালকা ছন্দে মিশ্রণ রীতির গান, বাউল ও কীর্তন অঙ্গের গান এর প্রভাবিত গান পাওয়া যায়। যেমন, কিছু গানের উদাহরণ-

- কেন দুরাশা ছলনা ভুলি, হইনু আপন হারা। (সিন্ধু, একতাল)
- বেলা বয়ে যায়। (ভীমপলশ্রী- ঝিঁঝিট খাম্বাজ)
- কেন খুঁজতে আস বিমল প্রেমে। (কীর্তন, একতাল)

রজনীকান্ত সেন :

রজনীকান্তের (১৮৬৫-১৯১০) কাব্যসংগীতে 'কথা ও সুরে'র মিলনেই অনবদ্য-সৃষ্টি। তাঁর গানে আধ্যাত্মভাবের একান্ত বিশুদ্ধ ভক্তিরসের অপূর্ব রূপ প্রকাশ পায়। তিনি প্রচার বিমুখ ছিলেন। লোকধারার মূল সুরটিকে বাহন করে তিনি তাঁর সঙ্গীত রচনা করেছেন। সহজ, সরল সুরে তিনি তাঁর গান রচনা করেছেন। তাঁর রচনায় ঈশ্বরভক্তির গান সর্বাধিক। সেই সাথে হাসির গান ও দেশপ্রেমমূলক গানও রচনা করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথ সেই যুগে প্রেমের গান যে পরিমাণ রচনা করেছিলেন সেই তুলনায় তাঁর মানবপ্রেম গীতের সংখ্যা খুবই সামান্য। স্বল্প সংখ্যক প্রেমের গানগুলিতে প্রেমবৈচিত্র্যের প্রকাশ নাই। বৈষ্ণব প্রেমাদর্শের প্রভাব রয়েছে কিছুটা, অথবা কখনো মধুর স্নিগ্ধ প্রেমের প্রকাশ পেয়েছে। কান্তকবির এমন আদর্শে কিছু প্রেমের গানের উদাহরণ-

- স্বপনে তাহারে কুড়ায়ে পেয়েছি, রেখেছি স্বপনে ঢাকিয়া।
- পরশ লালসে অবশ আলসে, ঢলিয়া পড়িত আমারি অঙ্গে।
- মধুর সে মুখখানি, কখনও কি ভোলা যায়।
- সখি রে মরমে পরশে তারি গান।
- নয়নমনোহারিকে গহন বন চারিদিকে, নব বকুল মাল-উরে প্রেমঅভিসারিকে।

অতুলপ্রসাদ সেন :

অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪) তাঁর গানগুলিকে দেবতা, স্বদেশ, প্রকৃতি মানব ও বিবিধ পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। মূলত তাঁর গানে প্রকাশ পায় গৃহবৈরাগ্য, মিলন আকাঙ্ক্ষা ও বিরহ ব্যথার গভীর বেদনা। কবির

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমচেতনায় নিঃসঙ্গ একাকীত্বের রূপ প্রকাশ পায়। কৈশোরে পিতৃবিয়োগ এবং কিছুদিন পর মায়ের পুনর্বার বিবাহ কবির মনকে গভীরভাবে আহত করেছিল। বিবাহ সূত্রে ভালোবেসে হেমকুসুম এর সহিত ১৯০০ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু বেশি দিন এই দাম্পত্যসুখ স্থায়ী হয়নি। ফলে বেদনা অতুলপ্রসাদের কৈশোর থেকে যৌবনের সঙ্গী হয়ে ছিল। তিনি ছিলেন একাকী নিঃসঙ্গ। তাঁর গানের বাণীতে এই নিঃসঙ্গতা ফুটে ওঠে-

একা মোর গানের তরী ভাসিয়েছিলাম নয়নজলে
সহসা কে এলে গো এ তরী বাইবে বলে ?...

কবির মানবপ্রেমগীতির কিছু উদাহরণ-

- কে তুমি বসি নদীকূলে একলা, কার লাগি এত উতলা।
- বধুঁ এমন বাদলে তুমি কোথা, আজি পড়িছে মম কত কথা।
- বধুঁ ক্ষণিকের দেখা তবু তোমারে, ভুলিতে পারে না আঁখি।
- ঘন মেঘে ঢাকা, সুহাসিনী রাকা, তুমি কি গো সেই মানিনী।
- করুণ সুরে ও কি গান গাও।
- চাঁদনী রাতে কে গো, আসিলে।
- কেন এলে মোর ঘরে আগে নাহি বলিয়া।
- মুরলী কাঁদে রাধে রাধে বলে।

কবির ব্যক্তি জীবনের একান্ত দুঃখবোধগুলিই যেন তাঁর প্রেমের গানে বার বার প্রকাশ পায়। প্রকৃতি, জগৎ জীবনের সবকিছুর মধ্যে একটি সুরকেই তিনি আপন করে যতনে রেখেছেন, তা হল বেদনার অশ্রুধারা। তাইতো সুখকে সাথী করতে না চেয়ে বলেছেন-

সুখ প্রভাতে মোরে করিয়া না সাথী
রাখিয়ো সাথে শুধু দুঃখের রাতি।

তাঁর অন্তর্মুখী প্রেমভাবনা শুধু বেদনার 'কথা ও সুরে' সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কাজী নজরুল ইসলাম :

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) পঞ্চকবিদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। প্রথম চারজন কবির জন্ম (১৮৬১-১৮৭১) এই দশ বছরের আবর্তে। নজরুলের জন্ম প্রায় আরো আটাশ (২৮) বছর পর। কবি তাঁর কাব্যসঙ্গীতে নানান ধরণের গান রচনা করেছেন। এর মধ্যে আমরা কবির কাব্যসঙ্গীতে প্রধান পরিচয় পাই, তাঁর প্রেমসঙ্গীতে। নজরুল বাঙালীর কাছে দেশপ্রেমে 'বিদ্রোহী' কবি হিসাবে পরিচিত। দেশপ্রেমের জোয়ার তাঁকে উদ্বেলিত করেছিল তেমনি মানবপ্রেমের কবি ছিলেন প্রাণবন্ত। কবির প্রেমের গানকে দুইটি ভাগে ভাগ করলে পাই একটি সাধারণ মানবপ্রেমের গান এবং অন্যটি গজল অঙ্গের প্রেমের গান।

Dhaka University Institutional Repository

মানবপ্রেমের গানগুলির প্রেমভাবনায় তিনি নর-নারীর দেহাশ্রিত প্রেমের রূপ বর্ণনা করেছেন। গানগুলির শব্দ প্রয়োগে দেখা যায় নারীর যৌবন তটে কবি দিওয়ানা। যেমন-

ত্যাগ নহে, ভোগ, ভোগ, তারি লাগি নেই জন বলীয়ান
নিঃশেষে ভরি লইবারে পারে, এত বড় যার প্রাণ!
যে জন নিঃস্ব, পঞ্জর তলে, নাই যার প্রাণধন
জীবনের এই উৎসবে তার হয়নি নিমন্ত্রণ।

নজরুল স্বভাবে ছিলেন আবেগপ্রবণ ও চিন্তায় বাস্তবনিষ্ঠ। দেহাশ্রিত কাব্যগীতিগুলোর বাইরেও কবির প্রেমের গান আছে। ভালোবাসার এই আবেগে কবির বিরহ, বেদনা, প্রেয়সীর জন্য অস্থিরতা প্রকাশ পায়। গানের বাণীতে শব্দের স্থূলতা বর্জিত সার্থক কিছু প্রেমের গানের উদাহরণ-

- আমার যাবার সময় হল দাও বিদায়, মোছ আঁখি দুয়ার খোল দাও বিদায়।
- জনম জনম গেল আশা পথ চাহি।
- যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পার নাই, কেন মনে রাখ তারে।
- তুমি আর একটি দিন থাকো।
- কেঁদেছ আকাশে চাঁদের ঘরণী।
- আঁধারে কালো কেশ দু'হাতে জড়ায়ে।

নজরুলের প্রেমের গানের সার্থক প্রকাশ পায় তাঁর গজল অঙ্গের গানে। শব্দচয়ন, সুর, তাল ও ছন্দের মাধুর্যে গানগুলি অপূর্ব। গজল গানে- গুলবাগিচা, রবাব, সাকী, দোদুল কায়া, সুর্মা আঁখি, চুনির হারে, শারাবের আঁখি, গুলবদনী, খুশির জলসা প্রভৃতি শব্দ চয়নে কবির অসাধারণ দক্ষতা দেখা যায়। যেমন-

নিশি ভোর হল জাগিয়া পরাণ পিয়া ...
... ভুলি বুলবুলি সোহাগে কত গুলবদনী জাগে
রাতি গুলসনে যাপিয়া, পরাণ পিয়া।

কবি আবার বলেছেন-

লাল শিরাজীর গেলাস হাতে তন্বী সাকী পড়ে ঢুলে
আমার গানে মিঠা পানির লহর বহে নহর-কূলে।

কাব্য রচয়িতারা প্রকৃতির রূপের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়নি এমনটা বিরল। নজরুলও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তিনি তাঁর প্রেমভাবনা প্রকৃতির রূপেও বর্ণনা করেছেন। ব্যক্তিগত প্রেমানুভূতিকে তিনি প্রকৃতির বিচিত্র রূপরসের মাঝে একাত্ম হয়ে তাঁর সঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন। যেখানে- ফাগুন, বসন্ত, বর্ষা, নিশীথস্বপনে প্রভৃতি সময়ের প্রকৃতির রূপ, প্রেমের বাণীতে প্রকাশ পেয়েছে। এমন কিছু গানের উদাহরণ-

Dhaka University Institutional Repository

আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন...
... আমারি মনের তৃষিত আকাশে
কাঁদে সে চাতক আকুল পিয়াসে
কভু সে চকোর সুধা- চোর আসে
নিশীথে স্বপনে জ্যোছনায়।

কবি আবার বলেছেন-

... বিজরী-জরির আঁচল, ঝলমল ঝলমল
নামিল নভে বাদল, ছল ছল বেদনায়,
দুলিছে মেখলা- হার শ্যামলী মেঘ মালার,
উড়িছে অলক কার অলকার ঝরোকায়।

শুধু বাণীতে নয়, সুরের ক্ষেত্রেও নজরুলের গজল গান শ্রেষ্ঠ। মিশ্র-পিলু, কাজরী, সিন্ধু-কাফি, গজল- মাতিয়া, ঝুমুর, লাউনী প্রভৃতি রাগের কাঠামোয় গজল গানগুলো সুরারোপিত। তালের ক্ষেত্রে- দাদরা, কাওয়ালি, পাঞ্জাবী ঠেকা ইত্যাদি হালকা তাল গ্রহণ করেছেন। গজল গানে তাল ফেরতার ও উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন-' বলো বঁধুয়ারে নিরজনে সখি দেখা হলে রাতে ফুলবনে'।

নজরুলের গানের কথায় অন্যান্য অনেক গুণী সুরকার সুর দিয়েছেন। তবে তাঁর গজল গানগুলি 'কথা ও সুরে' সম্পূর্ণ নিজস্ব। নজরুলের প্রেমের গান সহজ-সরল ভাষায় যে চিত্রপট তৈরী করে তা শ্রোতাকে মুগ্ধ করে। প্রকৃতির বর্ষা কিংবা বসন্ত কবির আবেগের ভাষা সব সময়ই বেদনার রূপ প্রকাশ পায়। ড. স্বপ্না ব্যানার্জি কবির প্রেমভাবনা সম্পর্কে দুটি চিত্রকল্পের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করে বলেন-

"প্রথমত, কবিচিত্তের বিরহ দীর্ণ প্রেমভাবনা, দ্বিতীয় কবির ভালবাসা মর্ত্যচারী। কোনো অতীন্দ্রিয় ভাবলোকের নিগূঢ় ব্যঞ্জনায় নজরুলের প্রেমভাবনা উচ্ছ্বাসিত নয়। বাস্তবনিষ্ঠ অথচ গভীর অনুভববেদ্য, চিত্রনিষ্ঠ অথচ 'প্রাত্যহিক আকাঙ্ক্ষা জড়িত, গৃহাভিমুখী অথচ রোমান্টিক'- মানবপ্রেমের নিবিড় প্রকাশে ভালোবাসার গানগুলি আবেগে-সংরাগে, বিরহে-মিলনে, আবেগে-আকাঙ্ক্ষায় অনুপম। এই বিরহানুভূতির প্রকাশ হিসাবে কিছু কিছু গানের উল্লেখ করি-

- সাঁঝের পাখিরা ফিরিল কুলায়।
- গানগুলি মোর আহত পাখির সম।
- দক্ষিনা মলয় আসে, ধীরে বহি।
- তুমি শুনিতে চেয়ো না আমার মনের কথা।
- পিয়ালা কেন মিছে, আনিলে ভরি।
- নতুন নেশায় আমার এ মন।
- হারানো হিয়ার নিকুঞ্জপথে।"[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের কাব্যগীতির বড় অংশ জুড়ে যেমনি আছে গজল গান, তেমনি আছে লোকসুরের প্রভাব। লোকসুরের সহজ, সাবলীল 'কথা ও সুর' তাঁর রচনায় গ্রামীণ প্রেমভাবনার একটি চিত্রপট পাওয়া যায়, যা কবির একান্ত নিজস্ব। তখনকার সময়ে পল্লীগীতি, ভাটিয়ালি, বাউল ইত্যাদি লোকসুরে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বন করে রচিত হত। নজরুল ও এই ধারায় ব্যতিক্রম ছিলেন না। যেমন-

ও কূল ভাঙা নদীরে-
আমার চোখে জল এনেছি মিশাতে তোর নীরে

আবার তিনি বলছেন-

বিজন গোঠে কে রাখাল বাজায় বেণু
আমি সুর শুনে তার বাউল হয়ে এনু।

সুতরাং দেখা যায় নজরুল ছিলেন মর্ত্যবাসনা কেন্দ্রিক কবি। বিবিধ বিচিত্র শব্দভান্ডারে তাঁর সঙ্গীত সমৃদ্ধ। ব্যক্তিজীবনে প্রেমের রোমান্টিকতা শুধু প্রেমের গানের উপজীব্য নয়, তিনি ছিলেন বাস্তবনিষ্ঠ প্রেমভাবনার কবি। ব্যক্তি জীবনের প্রথম প্রেমের প্রত্যাখ্যান তাঁর প্রেমের বেদনাকে অনেক গভীর করেছিল। মিলনের আনন্দের প্রকাশের থেকে বেদনার অশ্রু ধারাই তাঁর প্রেমচেতনার মূলরসদ। তাই বিভিন্ন উপমায় কখনও প্রকৃতিতে, কখনও লোকায়ত সুরে কিংবা গজলের 'বাণী ও সুরে' তাঁর কাব্যগীতিতে 'প্রেমভাবনার' প্রকাশ ঘটেছে। ঈশ্বরভক্তি, দেশপ্রেম ও মানবীয়প্রেম এই তিনটি বাংলা কাব্যগীতির প্রধান বিষয়বস্তু। কাব্যগীতিতে প্রেমের গানের সার্থকতা সবচেয়ে বেশি ফুটে উঠে। সকল সঙ্গীত রচয়িতারই তাঁদের প্রেমের গানের রচনায় সমসাময়িক সময়ে সফলতা পেয়েছিলেন। তবে সার্বিক আলোচনায় দেখা যায় নিধুবাবুর সময় থেকে প্রেমের গানের সূচনা এবং রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানের মধ্য দিয়ে এর পরিপূর্ণতা পায়।

নিধুবাবুর পূর্বে ভক্তিমূলক রাধা-কৃষ্ণের লীলার বর্ণনা পাওয়া যায়। পরবর্তীতে নিধুবাবু তাঁর রচনায় মানবীয় প্রণয়লীলার সঙ্গীত রচনা করেন। নজরুল ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁদের প্রেমসংগীত রচনায় বাস্তবনিষ্ঠ ছিলেন। রজনীকান্ত ছিলেন আধ্যাত্মিক চেতনায় মগ্ন ফলে দেহাশ্রিত প্রেমভাবনা তাঁর গানে প্রকাশ পায় নাই। অতুলপ্রসাদ মানবপ্রেমের গান লিখেছেন। তবে তাঁর প্রেমের গানে ব্যক্তি জীবনের নিঃসঙ্গতার প্রভাব পড়েছিল। বেশিরভাগ গানেই আমরা পেয়েছি বিরহ ব্যাকুলতা। বাংলা প্রেমসঙ্গীতের ধারায় সকল কবির প্রেমভাবনা সমানভাবে আমাদের বাংলা সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করেছে। তবে সকলের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানের স্বকীয়তা সবচেয়ে বেশি। কারণ রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিজীবনের প্রেমের অভিজ্ঞতা ও জীবনব্যাপী দুঃখকে এমনভাবে সম্বল করে প্রেমের গানে ব্যবহার করেছন যে, তাঁর প্রেমচেতনায় জীবনের অনুরাগ, বিরহ, মিলন প্রতীক্ষা, মৃত্যুশোক কোনটাই ব্যর্থতার সীমারেখায় আবদ্ধ হয়ে থাকে নি। তাঁর প্রেমের গানের রচনা সকলের থেকে পৃথক। যেমন-

"রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতা অনুভবের গভীরতায় অন্যান্যের রচনা থেকে পৃথক। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেমভাবনা প্রকৃতির ফুল,

Dhaka University Institutional Repository

চাঁদ, মলয়বাতাস ইত্যাদি উপমার সাহায্যে সীমিত অনুভবের জগতে বদ্ধ। নজরুলের প্রেমচেতনা পরিচিত উপমায় দেহাশ্রিত বাসনায় সীমাবদ্ধ। অতুলপ্রসাদের প্রেমভাবনা বিরহের স্নিগ্ধ বেদনায় অশ্রুভারাক্রান্ত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রেমচেতনায়, সর্বকালের মানুষের ভালোবাসার বহুবিধ অনুভব, অতলস্পর্শ গভীরতায় নিমজ্জিত।"[১৭]

প্রেমের গানে অনুভূতি প্রকাশে তিনি মনের অতিসূক্ষ্ম কোন ভাবকেই বাদ রাখেন নি। তিনি একমাত্র না পাওয়ার মধ্যে 'আনন্দ ও সুখবোধ' অনুভব করেছেন। পরিণত বয়সে প্রেয়সীকে প্রকৃতির রূপের সাথে বর্ণনা করেছেন। ভালোবাসার বিচিত্র অনুভবের গভীর বিস্তার তাঁর প্রেমের গানে। বাংলা প্রেমসঙ্গীতের ধারায় রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তার আরও একটি প্রধান কারণ 'কথা ও সুরে'র মিলনে কাব্যধর্মীতা। তিনিও পূর্বের সকল রচয়িতা দ্বারা অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর নিজস্ব সঙ্গীত রচনায় তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র। কবির প্রেমের গানে আমরা পাই সর্বব্যাপী পূর্ণতা। বাণী, সুর, ছন্দ, রূপময়তায়, উপমার ধ্বনি ব্যঞ্জনায় এবং বিবিধ, বিচিত্র ভাব ও অনুভবের মিশ্রণে রবীন্দ্রনাথে প্রেমের গান বাংলা প্রেমসঙ্গীতের ধারায় একান্তই স্বতন্ত্র।

তথ্যসূত্র

১. শান্তিদেব ঘোষ, *রবীন্দ্র সংগীত*, প্রকাশনা : বিশ্বভারতী, প্রকাশকাল : পৌষ ১৪০৮, পৃ. ১৯

২. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা*, প্রকাশনা : প্যাপিরাস, প্রকাশকাল : ভাদ্র ১৪১২, পৃ. ১৩

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সংগীতচিন্তা*, প্রকাশনা : বিশ্বভারতী, প্রকাশকাল : জ্যৈষ্ঠ ১৪১১, পৃ. ২৩৮, ২৩৯

৮. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা*, প্রকাশনা : প্যাপিরাস, প্রকাশকাল : ভাদ্র ১৪১২, পৃ. ৫৪

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সংগীতচিন্তা*, প্রকাশনা : বিশ্বভারতী, প্রকাশকাল : জ্যৈষ্ঠ ১৪১১, পৃ. ২৮৮-২৮৯

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০

১১. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন*, প্রকাশনা : বাংলা একাডেমী, প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ১২৭

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

১৩. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা*, প্রকাশনা : প্যাপিরাস, প্রকাশকাল : ভাদ্র ১৪১২, পৃ. ৬২

১৪. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন*, প্রকাশনা : বাংলা একাডেমী, প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ১৭২

১৫. স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়, *সমকালের বাংলাগান ও রবীন্দ্রসংগীত*, প্রকাশনা : প্যাপিরাস, প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃ. ৭৯

১৬. ড. স্বপ্না ব্যানার্জি, *নজরুল সংগীতের বিচিত্র ধারা*, প্রকাশনা : নজরুল ইনিস্টিটিউট, প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০০৫, পৃ. ৭০

১৭. স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়, *সমকালের বাংলাগান ও রবীন্দ্রসংগীত*, প্রকাশনা : প্যাপিরাস, প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃ. ২৫৫

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

রবীন্দ্রনাথের গানে প্রেম বিভিন্ন পর্যায়ে নানান মাত্রায় শিল্পরূপ লাভ করেছে। *গীতবিতানের* সমগ্র পর্যায় বিভাগে প্রেমের রূপটি পূজা, স্বদেশ, প্রেম, প্রকৃতি ও বিচিত্র ও আনুষ্ঠানিক ছয়টি পর্যায়ে নানান রূপে রূপাশ্রিত আছে। সমগ্র রচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রেমচেতনা অনুসন্ধানে শুধু প্রেমপর্যায়ের গানগুলির আলোকে গানের ভাব বিশ্লেষণে প্রেমের বহুমাত্রিক রূপ অনুসন্ধান করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানের দৃষ্টিভঙ্গির রয়েছে নানান রূপ ও রূপান্তর। কখনো তিনি মানব-মানবীর চিরকালে প্রেম-আকুতি নিয়ে গান লিখেছেন, কখনো তাঁর গানে প্রাধান্য পেয়েছে মিলনের বাসনা, কখনো মানবাত্মার চিরায়ত বিরহবোধ কখনো বা তাঁর গানে প্রেম ও পূজা মিলে মিশে হয়ে উঠেছে অভিন্ন সত্তা।

ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক আভিজাত্য,বাড়ির সাঙ্গীতিক পরিবেশ রবীন্দ্রনাথের কিশোর বয়সের মনন গঠনে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের সাহিত্য, গান ও কবিতা রচনার মূল ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে এই সময়ে। তাই সম্পূর্ণ অভিসন্দর্ভে কবিগুরুর প্রথম জীবনের রচনাবলীর প্রতি বিশেষ আলোকপাত করা হয়েছে। এই সময়ে কবির প্রেমচেতনার সূচনা হয়েছিল একান্ত নিজস্ব রচনাবলীর প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে। সময়ের সাথে সাথে পারিবারিক মৃত্যুশোক, বয়সবৃদ্ধির সাথে সাথে জীবন বোধের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রেমচেতনার পরিপূর্ণ রূপটি গঠিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রেম শুধু ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রেমে আবদ্ধ থাকেনি, তা প্রেম, পূজা ও প্রকৃতি এই তিনের মিলনে এক নৈসর্গিক রূপে রূপান্তরিত হয়েছে। ১৯০৯ সালের পূর্বে প্রেমের গানকে পাই প্রেমিক বা প্রেমিকার গান রূপে। যেমন, কিছু গানের উদাহরণ-

- কেহ কারো মন বুঝে না।
- তুমি কোন্ কাননের ফুল।
- হেলাফেলা সারাবেলা।
- সখী বহে গেল বেলা।
- অলি বার বার ফিরে যায়।
- প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে।
- পথহারা তুমি পথিক যেন গো।
- আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল।
- এমন দিনে তারে বলা যায়।
- হৃদয়ে এ কূল ও কূল।
- বাজিল কাহার বীণা।
- তুমি যেয়োনা এখনি।
- ভালোবেসে সখী নিভৃত যতনে।

Dhaka University Institutional Repository

- তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা।
- কেন বাঁজাও কাঁকন কনকন।
- কেন সারাদিন ধীরে ধীরে।
- কী সুর বাজে আমার প্রাণে।

এসব গানে রবীন্দ্রনাথ কালজয়ী হয়েও তখন পর্যন্ত তাঁর প্রেমের গান শুধুমাত্র প্রেমিক প্রেমিকার বিরহের গান। প্রথম জীবনের গানগুলির নারী চরিত্রে প্রতিফলিত হয় রাধার চিত্রপট। বৈষ্ণবধারার প্রভাবে সখী সম্ভাষণের ছলে বেদনা প্রকাশ করে আসছে রাধার উত্তরাধিকারীগণ। ব্যক্তিজীবনের স্বপ্নচারিনীগণ, যাঁদের তিনি মানসিক সাথী হিসেবে ভালোবাসলেও, তাঁরা কবিকে ভালোবেসেছিলেন মনেপ্রাণে। তাঁদের প্রভাবও পাওয়া যায় প্রেমের গানে। পরিণত বয়সে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান শুধু প্রেমিক প্রেমিকার গান নয় তা হয়ে ওঠে প্রেম, প্রকৃতি ও ঈশ্বর এই ত্রিধার মিলনে, বিশুদ্ধ প্রেমের গান। যেখানে প্রথম জীবনের ভালোবাসার মানুষগুলির উপস্থিতি উঁকি মারলেও তারা কখনো সেখানে প্রকৃতির সাথে মিশেছে, আবার কখনো প্রেম পূজায় স্থানান্তরিত হয়েছে। প্রেম যেন ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের জীবন অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে, আত্মসচেতনতার পরিচয়ে, আধুনিকতার রূপ নিয়ে স্বমহিমায় গৌরবান্বিত হয়েছে।

ঠাকুরবাড়িতে উচ্চাঙ্গসংঙ্গীতের পাশাপাশি অন্যান্য গানের চর্চাও চালু ছিল। ছেলেবেলায় বাড়ির সাঙ্গীতিক পরিবেশ দ্বারা তাঁর সঙ্গীতকে যেমন প্রভাবিত হতে দেখা যায়, তেমনি বৈষ্ণবপদ, প্রাচীন কবিদের পদ, বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের ফলে বিদেশী সুর দ্বারাও তিনি প্রভাবিত ছিলেন। ফলে প্রথম জীবনের গান রচনায় রাগসঙ্গীতের প্রভাব, ভাঙা গানের প্রভাব, বিদেশী সুরের প্রভাব পাওয়া যায়। তবে সবকিছু ছাঁপিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বকীয় ছিলেন তাঁর নিজস্বতায়। কী বাণী, কী সুর উভয়ই বিভিন্ন সময় নানান ভাবে প্রভাবিত হলেও তিনি সরাসরি কোনোটিরই অনুকরণ করেন নাই। 'বাণী ও সুরে'র যুগলমিলনে পরিণত বয়সে সৃষ্ট প্রেমের গান একান্ত তাঁর নিজের গান। এই জন্যই তিনি বাংলা গানের প্রেমসঙ্গীতের ধারায় সকলের মাঝে একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসাবে বিরাজমান। পরিণত বয়সে রচিত কবির একান্ত নিজস্ব প্রেমের গানের কিছু তালিকা-

- আমার মনের মাঝে যে গান বাজে।
- এই কথাটি মনে রেখো।
- দীপ নিবে গেছে মম।
- গানগুলি মোর শৈবালেরই দল।
- তোমায় গান শোনাবো।
- অনেক কথা বলেছিলেম।
- দিনশেষের রাঙা মুকুল।
- নাই যদি বা এলে তুমি।

Dhaka University Institutional Repository

- ভালোবাসি ভালোবাসি।
- সে আমার গোপন কথা।
- ছুটির বাঁশি বাজল।
- লিখন তোমার ধুলায় হয়েছে ধূলি।
- মনে রবে কিনা রবে আমারে।
- সে দিন দু'জনে দুলেছিনু বনে।
- কাঁদালে তুমি মোরে।
- সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে।
- না চাহিলে যারে পাওয়া যায়।
- আজি গোধুলিলগনে।
- শ্রাবণের পবনে আকুল বিষন্ন সন্ধ্যায়।
- মনে কী দ্বিধা রেখে গেলে চলে।
- যে ছিল আমার স্বপনচারিণী।
- তুমি কোন ভাঙনের পথে এলে।
- এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে।
- আমার আপন গান আমার অগোচরে।
- অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দ বন্ধনে।
- আমি যে গান গাই জানিনে সে।
- দিনান্ত বেলায় শেষের।

প্রেমের গানের রূপটি তাঁর প্রথম বয়সে যে প্রভাবগুলি দ্বারা প্রভাবিত ছিল, মধ্যবয়সে তা প্রাথমিকভাবে কাটিয়ে উঠে পরিণত বয়সে কবির গান একান্ত নিজের প্রেমের গান হয়ে ওঠে। সে গান কবি কার উদ্দেশ্যে গাইছেন তা তিনি নিজেও অবগত নন। তাঁর নিজের গান অগোচরেই তাঁর মন হরণ করে নেয়। যেমন ১৯৩৯ সালে রচিত গান-

আমার আপন গান আমার অগোচরে আমার মন হরণ করে,
নিয়ে যায় ভাসায়ে সকল সীমারই পারে।

আবার কবি একই সময়ে বলেছেন-

আমি যে গান গাই জানি নে সে কার উদ্দেশে।
যবে জাগে মনে অকারণে চঞ্চল হাওয়ায়,
প্রবাসী পাখি উড়ে যায়-
সুর যায় ভেসে কার উদ্দেশ্যে ॥

Dhaka University Institutional Repository

ওই মুখপানে চেয়ে দেখি-
তুমি সে কি অতীত কালের স্বপ্ন এলে
নূতন কালের বেশে।
কভু জাগে মনে আজও যে জাগেনি এ জীবনে
গানের খেয়া সে মানে আমার তীরে এসে।

আটাত্তর বছর বয়সে কবির পুরনো প্রেমের স্মৃতি নতুন করে মনে পড়ে। কিন্তু এই স্মৃতি যে কার তা তিনি জানেন না। শুধুই মনে অকারণ ব্যাকুলতা কবিকে আচ্ছন্ন করে রাখে। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান শুধু ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের জীবনের গান নয়, তাঁর গান বিশ্বনাগরিকের। 'বাণী ও সুরে'র অনন্যতায় কবির গান সবচেয়ে আধুনিক ও নিজস্বতায় স্বকীয়। কবির প্রেমচেতনা যেন তাঁর জীবনদর্শন ও প্রেমভাবনার এক সমন্বিত রূপ।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থাবলি

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, *তোমার সুরের ধারা*, ফার্মা কেএলএম, প্রাইভেট লিমিটেড, ২৫৭বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা, ৭০০০১২, গুরুপূর্ণিমা, ২রা জুলাই, ১৯৮৫।

অরুণকুমার বসু, *রবীন্দ্রসংগীতের রূপ-রূপান্তর*, সুধাংশু শেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা, ৭০০ ০৭৩, এপ্রিল ২০১৯, বৈশাখ ১৪২৬।

ইন্দিরা সংগীত-সংরক্ষণ প্রকল্প, *রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান*, সংগীত-শিক্ষায়তন, ১০৩ এ-সি বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১৯, বৈশাখ ১৩৯০।

করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, আষাঢ় ১৪০০ ॥ জুন ১৯৯৩।

করুণাময় গোস্বামী, *রবীন্দ্রসংগীতকলা (প্রথম খন্ড)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, আষাঢ় ১৪২০ ॥ জুন ২০১৩।

করুণাময় গোস্বামী, *রবীন্দ্রসংগীতকলা (দ্বিতীয় খন্ড)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, আষাঢ় ১৪১৯ ॥ জুন ২০১২।

কিরণশশী দে, *রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রামাণ্যসুর*, সুধাংশু শেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা, ৭০০ ০৭৩, আশ্বিন ১৪০৭ ॥ সেপ্টেম্বর ২০০০।

গোলাম মুরশিদ, *রবীন্দ্রনাথের নারী-ভাবনা*, অবসর প্রকাশনা ৪৬/১, ৪৬/২ হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর রোড, ঢাকা-১১০০, ফেব্রুয়ারি, ২০২০।

গৌরী ভট্টাচার্য, *রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিভিন্ন স্তর*, এম. মহসিন রুবেল, মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফেব্রুয়ারি ২০০৭।

ড. অরুণকুমার বসু, *বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত*, সুধাংশু শেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, ৭০০ ০৭৩, শ্রাবন ১৪০১ ॥ আগস্ট ১৯৯৪।

ড. আবদুল ওয়াহাব, *বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা সাম্প্রতিক বিবেচনা*, সাঈদ বারী, প্রধান নির্বাহী, সূচীপত্র ৩৮/২ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, বৈশাখ ১৪১৮ ॥ এপ্রিল ২০১১।

ড. প্রিয়ব্রত চৌধুরী, *রবীন্দ্রসংগীত*, দি জেনারেল বুকস্, কোলকাতা বইমেলা, ২০০১।

পৃথ্বীরাজ সেন, *দশ নারীর হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ*, প্রিয়া বুক হাউস, ৬৪ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০ ০৭৩, কলকাতা বইমেলা, ২০১৭।

প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী, *গীতবিতানের আরশীনগর*, একুশ শতক, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০ ০৭৩, জানুয়ারি ২০১১।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী ১ম খন্ড*, বিশ্বভারতী, বৈশাখ ১৪২৪।

প্রমথনাথ বিশী, *রবীন্দ্র সরণী*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, অগ্রহায়ন ১৪২০।

প্রমথনাথ বিশী, *রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, চৈত্র ১৪২৫।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী* **১***ম খন্ড*, আনন্দ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২০।

প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী ২য় খন্ড*, আনন্দ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩।

বিশ্বজিৎ ঘোষ, *অশেষ রবীন্দ্রনাথ*, অন্যপ্রকাশ, একুশের বইমেলা ২০২০।

ভূদেব চৌধুরী, *রবীন্দ্র-ভাবনা*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, মার্চ ২০০৮।

মৈত্রেয়ী দেবী, *রবীন্দ্রনাথ গৃহে ও বিশ্বে*, প্রাইমা পাবলিকেশন, ৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা- ৭, ৩ জুলাই ২০১১ ॥ ১৮ আষাঢ় ১৪১৮ রথযাত্রা।

মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা*, প্যাপিরাস, ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০, আগস্ট ২০০৫ ॥ ভাদ্র ১৪১২।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি*, বিশ্বভারতী, কার্তিক ১৪২৪।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সাহিত্যের স্বরূপ*, কবি প্রকাশনী, এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন, ঢাকা ১২০৫, অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৮।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সংগীতচিন্তা*, বিশ্বভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৪১১।

শান্তিদেব ঘোষ, *রবীন্দ্রসংগীত*, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৪০৮।

শান্তিদেব ঘোষ, *রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিত্রা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৯, এপ্রিল ১৯৯৭।

শম্ভুনাথ ঘোষ, *রবীন্দ্র সংগীতের ইতিবৃত্ত*, মীরানাথ, ৭২/৩ এফ/১ আর. কে. চ্যাটার্জী রোড, কলকাতা- ৭০০০৪২, মাঘ ১৪১৪ ॥ জানুয়ারি ২০০৮।

শামসুজ্জামান খান, *সাম্প্রতিক দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, আষাঢ় ১৪১৯ ॥ জুন ২০১২।

শেখ সাদী, *রবীন্দ্রনাথের সুফিয়ানা*, কথাপ্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৫।

সন্‌জীদা খাতুন, *রবীন্দ্রসংগীতের ভাবসম্পদ*, অবসর প্রকাশনা ৪৬/১, ৪৬/২ হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর রোড, ঢাকা- ১১০০, ডিসেম্বর ২০১৩।

সন্‌জীদা খাতুন, *রবীন্দ্রসঙ্গীত: মননে লালনে*, নবযুগ প্রকাশনী, ৬৭ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০, মাঘ ২০১৭ ॥ ফেব্রুয়ারি ২০১১।

সুচিত্রা মিত্র সুভাষ চৌধুরী, *রবীন্দ্রসংগীতায়ন* **১**, প্যাপিরাস, ২ গণেশ মিত্র লেন, কলিকাতা ৭০০ ০০৪, পৌষ ১৩৯৫ ॥ জানুয়ারি ১৯৮৯।

সুচিত্রা মিত্র সুভাষ চৌধুরী, *রবীন্দ্রসংগীতায়ন* **১**, প্যাপিরাস, ২ গণেশ মিত্র লেন, কলিকাতা ৭০০ ০০৪, বৈশাখ ১৩৯৭ ॥ মে ১৯৯০।

সুধীর চক্রবর্তী, *রবিকররেখা*, সিগনেট প্রেস, আনন্দ প্রকাশনা, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯, জুন ২০১৪।

সুধীর চক্রবর্তী, *গানের লীলার সেই কিনারে*, অরুণা প্রকাশনী, ৭ যুগলকিশোর দাস লেন,কলকাতা ৬, নববর্ষ ১৩৯২।

সুধীর চন্দ, *রবীন্দ্রসংগীত: রাগ-সুর নির্দেশিকা*, প্যাপিরাস, ২ গণেশ মিত্র লেন, কলিকাতা ৭০০ ০০৪, ডিসেম্বর ২০০৬।

Dhaka University Institutional Repository

স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়, *সমকালের বাংলাগান ও রবীন্দ্রসংগীত*, প্যাপিরাস, ২ গণেশ মিত্র লেন, কলিকাতা ৭০০ ০০৪, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ ॥ মাঘ ১৯৩৮।

Karunamaya Goswami, *Evolution of Bengali Music*, omni books, first published 2004

M.N. Mustafa, *Our Music (A Historical Study)*, Begum Bula Mustafa, october, 1977

S.K. Nandi, *Art And Aesthetics of Rabindra Nath Tagore*, Prof. Anilk K Sarkar, february 1999